রাতের রজনীগন্ধা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

চতুর্থ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৭১

—পাঁচ টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩৭-বি বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীপ্রদোষকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্যরসিক ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অকৃত্রিম বন্ধুবরেষু

—এই লেখকের—

মুখোশ	ঘুম নেই	কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী
মধুমিতা	উত্তরফাল্গুনী	অস্তি ভাগীরথী তীরে
ধূপশিখা	রতিবিলাপ	নীলতারা
বেলাভূমি	ধূসর গোধূলি	হীরা চুনি পান্না
উল্কা (নাটক)	চক্র (নাটক)	তাপসী (নাটক)

রাতের রজনীগন্ধা

॥ ১ ॥

কত দিন। মনে হয় যেন শুধু দিন, সপ্তাহ, মাস নয়, বছরের পর বছর যেন কেটে গেল। আরও কত বছর কেটে যাবে তাই বা কে জানে।

মধুছন্দা এ ঘর থেকে আর বেরুতে পারবে না। এ জীবনে আর বুঝি বেরুতে পারবে না। বেরুতে ওরা দেবে না।

আশ্চর্য। কোন দিন কি ভেবেছিল মধুছন্দা এমনি করে নিজের ঘরের মধ্যেই নিজে বন্দিনী হয়ে থাকবে।

খোলা দরজা, তবু ঘরের চৌকাঠটা পেরিয়ে যেতে পারবে না। ওরা যে বলে ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, সত্যিই ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি।

নিশ্চয়ই হয়েছে। নইলে এমন করে এই ঘরটার মধ্যে এতদিন সে আছেই বা কেমন করে?

অথচ ঐ যে জানালাটা!

দামী চিকন রঙিন নেটের পর্দা দিয়ে ঢাকা জানালাটা, মধুছন্দা জানে ঐ নেটের পর্দা টানা জানালার ওদিকেই তার এতদিনকার পরিচিত জগৎটায় যাবার সড়কটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে সোজা চলে গিয়েছে।

ঘুমিয়ে জেগে বলতে গেলে সর্বক্ষণ ঐ পথটারই স্বপ্ন দেখে মধুছন্দা।

হ্যাঁ, স্বপ্ন, স্বপ্নই দেখে বইকি। কারণ ঐ জগৎটা তো আজ তার কাছে স্বপ্নের মতই নাগালের বাইরে।

এই ঘর আর ঐ জগৎটার মাঝখানেই সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি মেলে রয়েছে কাটারিয়া, দুষ্মন্ত, গর্জন সিং আর ছগনলাল।

আট জোড়া চোখের নিষ্ঠুর সতর্ক দৃষ্টি।

একবার যদি কোনমতে ওদের ঐ আট জোড়া সতর্ক নিষ্ঠুর দৃষ্টিকে এড়িয়ে ঐ পথটায় গিয়ে পা দিতে পারত মধুছন্দা, সোজা তা হলে সে দৌড়তে শুরু করত।

দৌড়ত, দৌড়ত—যতক্ষণ না গিয়ে পৌঁছত তার পরিচিত

কলকাতা শহরটায়। আর একবার যদি সে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারত, মধুছন্দা হারিয়ে যেত—এই পৃথিবীতে কেউ আর মধুছন্দাকে খুঁজে পেত না।

কিন্তু উপায় নেই।

কাটারিয়া, ছগনলাল, গর্জন সিং আর দুষ্মন্ত।

আট জোড়া চোখের দৃষ্টি তার পথ আগলে দাঁড়াবে। ধরে এনে আবার এই ঘরটার মধ্যে পুরে দেবে।

আবার দু বছর ধরে যে একঘেয়ে জীবনের পুনরাবৃত্তি চলেছে তাই চলতে থাকবে।

দু বছর আগে যে সড়কটা দিয়ে রাত্রিশেষের আবছা আবছা আলো-আঁধারীতে বিরাট কালো রংয়ের তাদেরই মিনার্ভা গাড়িতে বসে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে এই বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকেছিল তার পর আর বেরুনো হল না।

দু বছর ধরে সেই সড়কটাতে ফিরে যাবার স্বপ্নই দেখছে মধুছন্দা তার পর থেকে।

ফিরে আর যাওয়া হয় নি!

কিন্তু তখন যদি বুঝতে পারত মধুছন্দা।

ঘুণাক্ষরেও যদি সে বুঝতে পারত, ঐ যে সে হোস্টেল থেকে বের হয়ে আসছে তার বহুদিনকার পরিচিত লোহার গেটটা দিয়ে আর তার ঐ গেট দিয়ে প্রবেশ করা হবে না, তা হলে নিশ্চয়ই আসত না দুষ্মন্তদার কথা শুনে, তাকে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে।

কিন্তু কেমন করেই বা জানবে, কেমন করেই বা বুঝবে অতবড় বিশ্বাসঘাতকতা দুষ্মন্তদা তার সঙ্গে করবে।

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই এখনো যেন তার কাছে কেমন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা—দুর্বোধ্য লাগে।

তার পর এখানে তাদের এই বাড়িটায় সে তো আগেও তার বাবার সঙ্গে কতবার এসেছে, এসে মাসখানেক করে কাটিয়েও গিয়েছে।

ঐ যে জানালাপথে যে সড়কটা দেখা যায়, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে

এঁকেবেঁকে সোজা গিয়ে কলকাতা যাবার চওড়া প্রশস্ত মেটাল বাঁধানো সড়কটার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, সেই রাস্তা ধরে কতদিন বাবার সঙ্গে, কতদিন একা একাও তো হেঁটে গিয়েছে সে।

কিন্তু তখন কি সে জানত দু বছর আগে সেই আলো-আঁধারি শেষরাত্রে এই বাড়িতে ঐ সড়কটা ধরে গাড়িতে চেপে এসে প্রবেশ করাই হবে তার এমনি করে সব কিছুর সমাপ্তি।

সমাপ্তি বৈকি। আজ সে পাগল। একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছে।

চার-পাঁচজন মস্তিষ্করোগের বিশেষজ্ঞ-ডাক্তার রায় দিয়েছেন তার সম্পর্কে—সে নাকি সুস্থ নয়।

প্রথমটায় কথাটা জানতে পারে নি মধুছন্দা।

এই ঘরটার মধ্যে তাকে সর্বক্ষণ নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। ঘরের চৌকাঠের বাইরে পর্যন্ত তার যাবার অধিকার নেই। যেতে দেওয়া হয়নি তাকে।

চিৎকার করে সে প্রতিবাদ জানিয়েছে, কেন, কেন তাকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।

কেউ তার কথায় কোন কান দেয় নি। বেশী চেঁচামেচি করলে জোর করে ধরে বেঁধে ঘুমের ঔষধ খাইয়ে বা ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে।

অসহায় সে ঘুমের ঔষধের প্রভাবে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রথম প্রথম বুঝতে পারে নি পর্যন্ত যে তাকে ঘুমের ঔষধ খাওয়ানো হচ্ছে বা ইন্‌জেকশনে ঘুমের ঔষধ তার দেহে প্রবেশ করানো হচ্ছে।

বুঝতে পারলে প্রথম মধুছন্দা এক বছর আগে তার মামা যখন তাকে দেখতে এসেছিল।

মামাকে দেখে সে কেঁদে ফেলেছিল।

কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল, এরা আমাকে ঘর থেকে বেরুতে দেয় না মামা। কেবল আমাকে ঔষধ খাওয়ায় আর ইন্‌জেকশন দেয়।

মামার পাশেই দাঁড়িয়েছিল দুষ্মন্তদা, সে তাড়াতাড়ি বলে,

এমনিতে বেশ শান্তই থাকে অবিনাশবাবু, হঠাৎ মধ্যে মধ্যে বলতে শুরু করবে, ওকে নাকি এই ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এখানে আসবার পর ঐটাই ওর মস্তিষ্কবিকৃতির প্রথম লক্ষণ দেখা দেয়। অথচ বাইরে কিছুতেই যাবে না। ঘরের মধ্যে থেকে কোথাও নড়বে না।

সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে উঠেছিল মধুছন্দা, মিথ্যে কথা। ওরা আমাকে কখনো বেরুতে দেয় না ঘর থেকে। মাথা আমার একটুও খারাপ হয় নি—আমি সম্পূর্ণ সুস্থ—সব ওদের শয়তানি, সব ষড়যন্ত্র—

দুষ্মন্ত বলে ওঠে, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—শয়তানি—ষড়যন্ত্র—আমরা সব খারাপ—তুমি এখন বিশ্রাম নাও। চলুন অবিনাশবাবু, আমরা নীচের ঘরে যাই—

দুষ্মন্ত একপ্রকার যেন ঠেলেই অবিনাশবাবুকে ঘর থেকেই বের করে নিয়ে গিয়েছিল।

পিছন থেকে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়েছিল মধুছন্দা, মামা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও—এখানে থাকলে আমি মারা যাব। মামা, মামা—

বলতে বলতে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করতেই পথ আগলে এসে দাঁড়িয়েছিল কাটারিয়া।

কিধার যাতা হ্যায় বেটি! তোমারা তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়।

কথাটা বলতে বলতে কাটারিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

সেই দিনই প্রথম বুঝতে পারে মধুছন্দা, তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে, তাই তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

সে পাগল! সে সুস্থ নয়!

সমস্ত দিন সমস্তটা রাত ভেবেছিল মধুছন্দা। সে পাগল। নিজেকেই নিজে বারবার প্রশ্ন করেছে, সত্যিই সে কি পাগল? সত্যিই কি তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে আর তাইতেই তাকে ঘরের মধ্যে সতর্ক প্রহরায় বন্দিনী করে রাখা হয়েছে?

পাগলের লক্ষণ কি?

পাগলরা কি বলে !

কি করে পাগলরা !

কেউ পাগল হয়ে গেলে কি হয় ?

ভাবতে ভাবতে সত্যিই যেন এক সময় তার মনে হয়েছিল পাগলই সে হয়ে গিয়েছে বুঝি। নইলে সবাই তাকে পাগলই বা বলছে কেন ? আর এমন করে ঘরের মধ্যে সর্বদা তাকে বন্দিনী করেই বা রেখেছে কেন।

কিন্তু কেমন করে হল সে পাগল।

কেনই বা হল পাগল।

ভাবতে ভাবতে কখনো নিজের মনে কেঁদেছে, কখনো নিজের মনে হেসেছে।

পরের দিন যাবার আগে মামা যখন তার সঙ্গে ঘরে দেখা করতে এলেন মামার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে হি হি করে হেসে উঠেছিল, তার পরই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল !

মামা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে চোখের জল মুছতে মুছতে বের হয়ে গিয়েছিলেন।

তার পর আবার যখন অনেকটা সুস্থ হয়েছে ব্যাপারটা আগাগোড়া বোঝবার চেষ্টা করেছে।

সবাই বিশ্বাস করেছে সে পাগল।

পাগল, সে পাগল।

কিন্তু কেমন করে পাগল হল সে। বাবার আকস্মিক মৃত্যুটা তাকে নিদারুণ আঘাত দিয়েছিল, বিমূঢ় করে দিয়েছিল তাকে সত্যি ! সমস্ত যেন তার কাছে শূন্য, মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল।

হোস্টেলেও ফিরে গিয়েছিল সে একটা শূন্য হাহাকার নিয়ে। কিছুই ভাবতে পারছিল না। কিছুই করতে পারছিল না। ক্লাসে গিয়ে বসে সকলের পিছনের বেঞ্চে চুপচাপ।

অধ্যাপকদের পড়ানো কিছুই কানে আসত না।

ছুটির পরে খেলার মাঠেও যেত না—নিজের ঘরের মধ্যে একা একা চুপচাপ বসে থাকত।

ঠিক এমনি যখন মনের অবস্থা হঠাৎ গিয়ে হাজির হল হোস্টেলে তাদের বাড়ির গাড়ি এবং দুষ্মন্তর চিঠি—বৈষয়িক ব্যাপার, অবিলম্বে তার এখানে চলে আসা প্রয়োজন।

ভাবতে পারে নি কিছু, ভাবেও নি কিছু।

চিঠিটা পেয়েই মেট্রনের কাছে গিয়ে বিদায় নিয়ে সোজা এসে গাড়িতে উঠে বসেছিল। আর অবিশ্বাসই বা সে করবে কেমন করে দুষ্মন্তদাকে। যে লোকটা মাত্র দু মাস আগেও তার বাবার মৃত্যুর পর তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তার সঙ্গে কেঁদেছিল, সেই লোকটাই যে তার এতবড় সর্বনাশ করবে, তাকে মিথ্যা করে ডেকে আনবে কৌশলে এই বাড়িতে, মানুষটার স্নেহের ছদ্মবেশের আড়ালে এতবড় একটা শয়তান লুকিয়ে ছিল—কেমন করেই বা সে বুঝতে পারবে। তা হলে কি দুষ্মন্তর ফাঁদে পা দিত সে।

শেষ রাত্রে প্রথম যেদিন সোজা কলকাতা থেকে গাড়িতে চেপে এই বাড়িতে আসে, উপরের তলার ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে।

ঘরের মধ্যে বিবাহের আয়োজন চলেছে।

একটু যেন বিস্মিতই হয়েছিল বিবাহের আয়োজন দেখে।

ব্যাপারটা সে ঠিক কি বুঝে উঠতে পারে নি।

ঘরের মধ্যে বাবার আমলের এক চাকর ছিল আর ছিল একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত।

ব্যাপারটা কি তাদেরই জিজ্ঞাসা করবে ভাবছে, দুষ্মন্তদা এসে ঘরে ঢুকল, এই যে ছন্দা, তুমি এসে গিয়েছ—

হ্যাঁ, তোমার চিঠি পেয়েই চলে এলাম। কিন্তু কি ব্যাপার দুষ্মন্তদা!

এসো, পাশের ঘরে এসো, সব বলছি—

কোন রকম দ্বিধা না করেই মধুছন্দা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

কোন রকম দ্বিধা নয়, কোন সংকোচ নয়—সোজাসুজিই একেবারে বলেছিল দুষ্মন্ত, চিঠিতেই অবিশ্যি কথাটা জানাব তোমাকে ভেবেছিলাম কিন্তু আবার মনে হল আসছই যখন জানতে তো পারবেই দু চার ঘণ্টা এদিক ওদিক—

কিন্তু কথাটা কি বল তো দুষ্মন্তদা।

তোমার বিয়ে—হাসতে হাসতে বলেছিল দুষ্মন্ত।

কি! কি বললে?

তোমার বিয়ে।

কয়েকটা মুহূর্ত বাক্যস্ফূর্তি হয় নি মধুছন্দার।

কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে চেয়েছিল দুষ্মন্তর মুখের দিকে।

কথাটা যেন একেবারেই বুঝতে পারে নি।

চেয়ে রইলে কেন অমন করে? বিয়ে তোমার কথাটা বুঝতে পারছ না! দুষ্মন্ত আবার বলল।

না।

আবার হাসে দুষ্মন্ত, বুঝতে পারবে'খন। কিন্তু লগ্ন এক্ষুনি—আর দেরি করো না। যাও—পাশের ঘরে তোমার জন্য লাল বেনারসী এনে রেখেছি—তাড়াতাড়ি পরে রেডি হয়ে নাও—আমিও প্রস্তুত হয়ে নিই।

আমার বিয়ে—তা পাত্রটি কে দুষ্মন্তদা?

ঐ দেখ, পাত্র আবার কে—আমি—

কি বললে! তুমি—

হ্যাঁ—আমি—

তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে?

হ্যাঁ—কাকাবাবুই স্থির করে রেখেছিলেন অনেকদিন। হঠাৎ হার্টফেল করলেন—নইলে ইচ্ছা ছিল তাঁর নিজেই চার হাত এক করে দিয়ে যাবেন—

আমার বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল—

কেন, তুমি কি কথাটা শোন নি নাকি?

না।

কিন্তু সবাই জানে—

জানতে পারে—তবে আমি জানি না।

বেশ তো—তোমাদের পুরনো চাকর ঐ বসন্তকে ডাকো—সেও জানে—মরবার সময়ও কাকাবাবু বলে গিয়েছেন—

বসন্তকে কিছু আমার জিজ্ঞাসা করতে হবে না, আমার বাবা কি বলে গেছেন না গেছেন আমি খুব ভাল করেই জানি।

কথাটা বলে মধুছন্দা এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে দুষ্মন্ত বলে, তা যাচ্ছ কোথায়?

কলকাতার হোস্টেলে ফিরে যাচ্ছি—

দাঁড়াও, দাঁড়াও—

না।

মধুছন্দা আবার পা বাড়ায়।

মধুছন্দা!

মধুছন্দা মরালীর মত গ্রীবা বেঁকিয়ে তাকাল দুষ্মন্তর দিকে।

তা হলে তুমি তোমার বাবার শেষ ইচ্ছা পালন করবে না?

শেষ ইচ্ছা তাঁর কিছু সে রকম আমার জানা থাকলে পালন করতাম বৈকি! সরে দাঁড়াও দুষ্মন্তদা, আমার পথ ছাড়ো।

দুষ্মন্ত ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিল। তাই ওর মুখের দিকে চেয়েই দৃঢ় কণ্ঠে শেষের কথাগুলো বলে, শোন মধুছন্দা, পাগলামি করো না—

পাগলামি আমি করছি না—করছ তুমিই—নইলে অমন পাগলের মত কথা আমার সামনে উচ্চারণও করতে না—

কি বললে, পাগলের মত?

কেন তোমারও কি তাই মনে হচ্ছে না?

হঠাৎ যেন দুষ্মন্তর মুখের চেহারাটা বদলে গেল। একটা কঠিন সংকল্পে যেন তার মুখটা থমথমে হয়ে ওঠে।

বলে, তা হলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে না?

আবেল-তাবোল বকো না, সরে দাঁড়াও—পথ ছাড়ো।

পথ আমি ছেড়ে দিচ্ছি, তবে বিয়ে আমাদের আজকের এই লগ্নে হবেই জেনো—

সত্যিই দেখছি এখন তুমি পাগলই হয়ে গিয়েছ।

পাগল যে আমি হই নি—তার প্রমাণ তুমি এখুনি পাবে।

প্রমাণ পাব ?

কঠিন ব্যঙ্গ যেন উপ্‌চে পড়ে মধুছন্দার কণ্ঠ থেকে।

হ্যাঁ। তবে আমি ভেবেছিলাম—

কি ভেবেছিলে বল তো! তোমার গলায় আমি মালা দেব ?

হ্যাঁ, ভেবেছিলাম তুমি বুদ্ধিমতী, সহজ ভাবেই ব্যাপারটা নেবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি বলপ্রয়োগই তুমি চাও—

দুষ্মন্তদা!—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কি বলতে গিয়েও যেন মধুছন্দা থেমে যায় দরজার দিকে নজর পড়তেই।

চার-পাঁচটি অপরিচিত মুখ দরজার ওপাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে।

হঠাৎ যেন মধুছন্দার মাথায় খুন চেপে যায়। প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিয়েই যেন দরজার গোড়ায় যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সরিয়ে দিয়ে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে মধুছন্দা। এবং লাথি দিয়ে দিয়ে মাঙ্গলিক আয়োজন সব ছত্রাকারে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

তার পরই ঘর থেকে বের হয়ে আসতে গিয়ে বাধা পায়।

ঘরের মধ্যে এসে তখন দাঁড়িয়েছে দুষ্মন্ত তার দলবল নিয়ে। এবং মধুছন্দা ঘরের দরজার দিকে পা বাড়াতেই সকলে এসে ওকে জাপটে ধরে দুষ্মন্তব ইঙ্গিতে।

চেঁচিয়ে ওঠে মধুছন্দা, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—আমাকে—

কিন্তু কেউ ওর কথা শুনল না।

সকলে ধরে বেঁধে এনে এই ঘরের মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে তালা দিয়ে দিল।

॥ ২ ॥

তিন দিন।

তাকে বেরুতে দেবে না বলে বাইরে থেকে দরজায় শিকল দিয়েছিল আর সেও ওরা যাতে ঘরে না প্রবেশ করতে পারে সেই জন্য ভিতর থেকে ঘরের দরজায় খিল তুলে দিয়েছিল।

তিন দিন এই ঘরের মধ্যে ঘরের দরজার খিল তুলে দিয়ে ভিতর থেকে পড়ে রইল মধুছন্দা, খায় নি, স্নান করে নি, ঘুমোয় নি।

তার পর ওরা যেমন টের পেয়েছে যে মধুছন্দা ঘরের খিল তুলে দিয়েছে, ভিতর থেকে বাইরে থেকে ওর বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়েছে, ওকে ডেকেছে বার বার দরজা খুলে দেবার জন্য কিন্তু মধুছন্দা না দিয়েছে কোন সাড়া, না দিয়েছে দরজা খুলে।

তখন ওরা বাইরে থেকে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেছে। ও পালাবার চেষ্টা করেছে তখন কিন্তু পারে নি। বরং জোর করে ওকে একটা কি ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

ঘুম ভাঙ্গার পর দেখেছে চার-পাঁচজন ডাক্তার তার শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে।

তার পর থেকে সে এই ঘরে বন্দিনী।

এই দু বছর ধরে প্রথম প্রথম সে এখান থেকে পালাবার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি, কিছুতেই পারে নি এই ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে বাইরে যেতে।

বারবার ক্রমান্বয়ে ঘুমের ঔষধ খাইয়ে আর ইন্‌জেকশন দিয়ে দিয়ে তাকে আজ এমন করে ফেলেছে যে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে পা দুটো তার কাঁপতে শুরু করে!

মাথাটার মধ্যে কেমন যেন ঝিম ঝিম করে। চোখের সামনে কেমন যেন সব ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হয়ে যায়। বাধা দেবার শক্তিটুকুও পর্যন্ত যেন আজ সে হারিয়ে ফেলেছে। অথচ আজও ওরা তাকে নিষ্কৃতি দেয় না।

প্রতি রাত্রে ওরা ওকে ঘুমের ঔষধ হয় খাওয়ায়, না হয় ইন্‌জেকশন দেয় !

রোজকার মত আজও রাত্রে কাটারিয়া তাকে ঘুমের ঔষধ খানিকটা জোর করেই খাইয়ে দিয়েছে সবটা খাওয়াতে পারে নি—

ধাক্কা দিয়ে কাটারিয়ার হাত থেকে ঔষধের গ্লাসটা ফেলে দিয়েছিল ঘরের মেঝেতে। গ্লাসটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

তার পরও কাটারিয়া চেষ্টা করেছিল আর একটা গ্লাসে ঔষধ ঢেলে তাকে এনে খাওয়াতে। হাতটা ধরে কাটারিয়ার এমন কামড় দিয়েছে যে চীৎকার করে কাটারিয়া পালিয়েছে ঘর থেকে।

কাটারিয়া ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই উঠে গিয়ে ঘরে দরজাটা মধুছন্দা ভিতর থেকে খিল তুলে আটকে দিয়েছে।

আজ আর বিরক্ত করতে পারবে না কেউ তাকে।

আজকের রাতটার মত মধুছন্দা নিশ্চিন্ত।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে চাইছে কিন্তু আজও ঘুমোবে না—কিছুতেই ঘুমোবে না। আজ ও জেগে থাকবেই।

বাইরের দালানে ঘড়িটা ঢং ঢং করে একটু আগে রাত বারোটা ঘোষণা করেছে।

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সমস্ত বাড়িটা। সবাই নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পৃথিবীর সবাই এখন ঘুমোচ্ছে, তারও চোখে ঘুম নেমে আসতে চাইছে—কিন্তু মধুছন্দা ঘুমোবে না।

মাথাটার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে।

দপ দপ করছে কপালের দু পাশে রগ দুটো।

উঠে বসল ধীরে ধীরে মধুছন্দা শয্যার উপরে।

ঐ জানালাটা। ঐ জানালার বাইরে সেই সড়কটা। সে সড়কটা উঁচুনীচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে গিয়ে মিশেছে কিছু দূরের চওড়া মেটাল বাঁধানো রাস্তাটায়। এবং যে রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে মধুছন্দা জানে কলকাতায়।

চেয়ে থাকে মধুছন্দা ঘুম ঘুম চোখে নেটের পর্দা টানা জানালাটার দিকে।

বাইরে নিশ্চয়ই চাঁদ উঠেছে। ম্লান চাঁদের আলোর আভাস নেটের পর্দার ওদিকে নেমেছে মনে হয়। শয্যা থেকে নামল মধুছন্দা। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় জানালাটার কাছে।

কাঁপছে হাতটা, তবু হাত বাড়িয়ে পর্দাটা সরিয়ে দেয় জানালা থেকে।

ঐ—ঐ তো সেই চেনা সড়কটা।

ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চাঁদের আলোয় গা এলিয়ে রয়েছে। ঐ দূরে ধূসর পাহাড়।

দৃষ্টির সামনে ঐ যে মৃদু চন্দ্রালোকিত রাস্তাটা মধুছন্দার, ঐ রাস্তাটায় গিয়ে কি সত্যিই কোনমতেই তার পক্ষে আর পৌঁছানো সম্ভব নয়।

অনেক অনেক দিনের সেই পুরানো প্রশ্নটাই যেন আজও এই মধ্য রাত্রে জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে আবার মধুছন্দার মনের মধ্যে লোভের মুক্তির হাতছানি দিতে থাকে।

ঐ সড়কটায় গিয়ে কোনমতে পৌঁছতে পারলেই সে বাঁচতে পারে। দুষ্মন্তর ষড়যন্ত্রর হাত থেকে সে মুক্তি পেতে পারে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুক্তি পেত সে ঐ সড়কটায় যদি কোনমতে গিয়ে ও পৌঁছতে পারত।

পারত কেন?

চেষ্টা করলে কি সে এখনো সত্যিই পারে না?

ঘরের দরজাটা খুলে যদি সে আবার ঘুমিয়ে পড়বার আগেই কোনক্রমে বের হয়ে পড়ে এখুনি।

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সেই দুরন্ত ভয়টা রোজকার মতই উঁকি দিতে থাকে। কাটারিয়া, গর্জন সিং, ছগনলাল ও দুষ্মন্তর মুখগুলো পর পর মনের কোণায় উঁকি দেয়। যদি ওদের মধ্যে কেউ জেগে থাকে।

তা হলেই তো সে ধরা পড়ে যাবে।

পথ রোধ করে ওরা দাঁড়াবে।

তবু—তবু—আজ একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি।

মধুছন্দা জানালার ধার থেকে সরে আসে। বুকটার মধ্যে কাঁপছে। দুপ্ দুপ্ করছে বুকটার মধ্যে, যেন কে হাতুড়ি পিটছে।

পায়ে পায়ে মধুছন্দা দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

ততক্ষণে এর আর একটা কথা মনে পড়ে যায়।

বারান্দার শেষে বাথরুমের পিছন দিয়ে একটা ঘোরানো সিঁড়ি আছে বাইরে দোতালার লোহার, বাথরুমে ঢুকে সেই সিঁড়ি দিয়েই তো সোজা বাগানে নেমে যেতে পারে নীচে।

তার পর বাগানের দরজা দিয়ে রাস্তায়।

এগিয়ে যায় মধুছন্দা দরজার দিকে।

কাঁপছে হাতটা, তবু খিলটায় হাত রাখে। ঢিপ্ ঢিপ্ করছে বুকটার মধ্যে। বুকের ধুকপুকুনিটা যেন দুই কানে এসে ধাক্কা দেয়। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দরজার খিলটা খুলেও কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মধুছন্দা।

তার পর একসময় দরজার কবাট দুটো ঈষৎ টানতেই দরজার কবাট দুটো ফাঁক হয়ে গেল।

আঃ, একটা নিঃশ্বাস যেন এতক্ষণে মধুছন্দা বুক ভরে টেনে নেয়।

দরজাটা তা হলে বাইরে থেকে ওরা আটকায় নি, খোলাই আছে দরজাটা।

মধুছন্দা জানত না যে ইদানীং আর কাটারিয়া মধুছন্দার ঘরের দরজাটা বন্ধ করা প্রয়োজন বোধ করত না। মধুছন্দা আর কোনদিন পালাবে না এমনই একটা স্বতঃসিদ্ধ ধারণা যেন হয়ে গিয়েছিল ওদের সবার।

দরজাটা খুলেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ভেজিয়ে খিল তুলে দিয়েছিল মধুছন্দা।

এই তো দরজা তার ঘরের খোলা রয়েছে।

গভীর রাত। সকলেই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

এই মুহূর্তে কি ও দুই বছরের এই বন্দীশালা থেকে বের হয়ে যেতে পারে না।

বের হলেই তো তার সেই পরিচিত সড়কটা। যে সড়কটা সোজা গিয়ে মিশেছে কলকাতা যাবার প্রশস্ত মেটাল বাঁধানো রাস্তাটার সঙ্গে বরাবর! যে সড়কটার এই দুই বছর ধরে সে কেবলই স্বপ্ন দেখেছে।

সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। পা দুটোও যেন কেমন অবশ হয়ে আসছে।

পারবে তো মধুছন্দা?

পারতে তাকে হবেই। যেমন করেই হোক তাকে পারতেই হবে। মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল মধুছন্দা। তার পরই তার কক্ষসংলগ্ন ছোট ঘরটায়—যার মধ্যে তার জিনিসত্র থাকত সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আলোটা জ্বালাল।

সামনেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নার মসৃণ গাত্রে নিজের চেহারাটা দেখতে পেল। মেঘের মত সারা পিঠ ছড়ানো তার চুল।

এই চুল নিয়ে তো সে পথে বেরুতে পারে না।

ড্রয়ার থেকে কাঁচিটা বের করে কচ কচ করে মাথার সেই দীর্ঘ কেশ কেটে ফেলল। তার পর শাড়িটা খুলে মালকোঁচা দিয়ে পুরুষের মত পরল। আর একটা রঙিন শাড়ি নিয়ে এলোমেলো করে মাথায় পাগড়ি বাঁধল!

ব্যাস্! এইবার সে খানিকটা নিশ্চিন্ত।

এবার হয়তো তাকে দেখলেই চট করে কেউ চিনতে পারবে না।

পাশেই পড়েছিল তার অ্যাটাচী কেসটা।

এই দু বছর সে কখনো ওটা স্পর্শও করে নি।

অ্যাটাচী কেসটা খুলতেই তার মধ্যে বটুয়াটা পেল। বটুয়াটা খুলে দেখল খুচরো এবং নোটে টাকা কুড়ির মত আছে।

খুচরো পয়সা রেখে নোটগুলো নিয়ে কোমরে গুঁজল।

আবার খিল খুলে ঘরের আলোটা নিভিয়ে ঘর থেকে পা টিপে টিপে বের হয়ে এল মধুছন্দা।

॥ ৩ ॥

টানা বারান্দাটা খাঁ খাঁ করছে যেন।

বারান্দার দেওয়ালে টাঙানো জার্মান ওয়াল-ক্লকটার শব্দ শোনা যায়, টক্ টক্ টক্, টক্ টক্—

নিঃশ্বাস বন্ধ করে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলে মধুছন্দা।

বারান্দার শেষে বাথরুম। বাথরুমের মধ্যে ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তার পর ওদিককার দরজাটা খুলে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে এল বাগানে।

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে আকাশের ত্রয়োদশীর চাঁদটা তখন বোধ হয় ঢাকা পড়েছে। বাগানের মধ্যে মনে হয় ঝুপসি ঝুপসি অন্ধকার এখানে ওখানে জমাট বেঁধে আছে। কোথায় একটা ঝিঁঝিঁ একটানা ডেকে চলেছে।

অগ্রহায়ণ শেষ হয়ে এল—এদিকটায় ইতিমধ্যে বেশ শীত পড়েছে। অথচ সেই ঠাণ্ডার মধ্যেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে।

দীর্ঘ দুই বছরের অনভ্যস্ততা পা দুটো যেন টেনে টেনে ধরে—জড়িয়ে যায়।

কিন্তু বের হয়ে তাকে যেতে হবেই।

এই বাড়ির সীমানা তাকে যত শীঘ্র হোক পার হয়ে যেতে হবেই।

রাতের অন্ধকারটা থাকতে থাকতে যত দূর সম্ভব দূরে তাকে পালিয়ে যেতে হবেই।

বাগানের চতুঃসীমানায় যে পাঁচিলটা সেটা বেশ নীচু।

সেই পাঁচিলই কোনমতে পার হয়ে এদিককার রাস্তায় এসে পা রাখল মধুছন্দা। তার পরই আর কোনদিকে তাকায় না, হন হন করে হাঁটতে শুরু করে দেয়।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় এসে সেই রাস্তাটা যেখানে বড় প্রশস্ত মেটাল বাঁধানো বড় রাস্তাটার সঙ্গে মিশেছে সেইখানে পৌঁছল।

পা দুটো তখন যেন টন টন করে ছিঁড়ে পড়ছে।

কোথাও কিছুক্ষণের জন্য একটু বসে বিশ্রাম নিয়ে নিলে হত না! কিন্তু কোথায় নেবে বিশ্রাম। ঘুম আসচে দু চোখ ভরে।

অসহায় দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়।

রাস্তার ধারে বিরাট একটা শাখাপ্রশাখাবহুল বটগাছের নীচে এগুতেই ওর নজরে পড়ল মাল বোঝাই একটা লরী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আরো একটু এগিয়ে গেল মধুছন্দা। এবারে ও দেখতে পেল রাস্তার উপরে লরীর গা ঘেঁষে দুটো লোক মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে নাক ডাকাচ্ছে থেকে থেকে।

একবার ভাবল মধুছন্দা ওদের পাশেই গিয়ে শুয়ে পড়ে।

শুয়ে পড়ে তার পর।

যেন, রাস্তার উপরেই ঘুমিয়ে পড়বে।

কিন্তু রাস্তার উপরে ঘুমোবার জন্য তো সে বাড়ি থেকে এই মধ্য রাত্রে পালিয়ে আসে নি। তাকে পালাতে হবে। দূরে আরও অনেক দূরে, যেখানে দুষ্মন্ত তার নাগাল পাবে না।

কিন্তু একটু বিশ্রাম না নিয়ে তো সে আর এক পাও চলতে পারছে না। একটু বিশ্রামের তার যে বড় দরকার বড় প্রয়োজন।

আচ্ছা ঐ গাড়িটা মাল নিয়ে কোথায় চলেছে।

নিশ্চয় অনেক দূর।

হাজারীবাগ—পাটনা—আসানসোল—কলকাতা নানা জায়গায় এই ভাবে লরী বোঝাই করে মাল আনা নেওয়া হয় বাবার মুখেই সে কতদিন শুনেছে। রাঁচী হাজারীবাগ রোড—জি, টি, রোড ধরে

ঐ সব লরী চলে। হয়তো সেই রকমই কোন জায়গায় মাল ভর্তি ঐ লরীটা চলেছে। কোন মতে যদি ঐ লরীটার উপর ও উঠে বসতে পারে, বিশ্রামও নেওয়া হবে ওর—এ জায়গা ছেড়ে অনেক দূরে যেখানেই হোক চলে যাওয়া হবে। কিন্তু গাড়ির উপর উঠলে ওরা যদি পরে জানতে পারে? নামিয়ে দেবে হয়তো—তা দিক—।

মনে মনে মতলবটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মধুছন্দা স্থির করে ফেলে লরীটার উপরেই উঠে বসবে।

তার পর যা আছে তার ভাগ্যে।

বার দুই চাকার উপর পা দিয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করল মধুছন্দা কিন্তু পারে না।

হাঁটু দুটো এবং পা ছড়ে গেল।

কিন্তু তবু ও ভগ্নোৎসাহ হয় না। লরীর উপরে তাকে যেমন করে হোক উঠতেই হবে।

অবশেষে অনেক চেষ্টায় কোনমতে চাকার উপর পা দিয়ে যে বিরাট মোটা কাছি দিয়ে মাল বাঁধা ছিল সেই কাছি ধরে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে লরীর উপরে মালগুলোর উপরে গিয়ে পৌঁছল মধুছন্দা।

বিরাট বিরাট প্যাকিং বাক্স আর কিছু মাল বোঝাই বস্তা দিয়ে গাড়িটা বোঝাই। তারই মধ্যে একটা ফাঁকে কোনমতে নিজেকে গুঁজে একটা বস্তার উপর শরীরটা এলিয়ে দিল মধুছন্দা।

কত রাত হয়েছে কে জানে।

ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বটগাছের পাতাগুলো অন্ধকারে বাতাসে সিপ্ সিপ্ শব্দ তুলছে।

ব্যথায় টন টন করছে পা দুটো। পা দুটো একটু ছড়িয়ে দিতে পারলে হয়তো আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু তার কোন উপায় নেই।

এমন ভাবে মাল বোঝাই লরী। কোথায় যাচ্ছে কে জানে! ডালটনগঞ্জ—পাটনা—হাজারিবাগ, না—আসানসোল—কলকাতা।

বাবার মুখে কতদিন শুনেছে এমনি সব মাল বোঝাই লরী জি, টি,

রোড ধরে নানা জায়গায় যাতায়াত করে। কখনো দিনের বেলা একটানা চলে তার পর হয়তো রাত্রের দিকে পথের ধারে কোথাও লরীটা একপাশে থামিয়ে বিশ্রাম নেয়।

সেই রকম মাল বোঝাই কোন লরী হয়তো।

গাছটার নীচে বেশ অন্ধকার হলেও মাথার উপরে ডালপালা ও পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে একটুখানি রাতের আকাশ চোখে পড়ে। চোখে পড়ে কালো আকাশের বুকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু চারটে তারা।

লোকগুলো ঘুম থেকে উঠে গাড়ি চালাবার আগে কোনমতে যদি জানতে পারে যে সে ঐ গাড়ির উপরে গুটিসুটি দিয়ে শুয়ে আছে, ওকে হয়তো গলাধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেবে।

কিন্তু মধুছন্দা যদি ওদের মিনতি করে বলে, আমাকে তোমরা কলকাতা পৌঁছে দাও—তোমাদের টাকা দেব।

তাহলেও কি ওরা ওকে একটু দয়া করে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে না!

পৃথিবীতে সবাই হয়তো দুষ্মন্ত নয়। তার প্রতি দয়াও হয়তো কারো কারো হতে পারে।

কিন্তু তার পর।

কলকাতায় পৌঁছেই বা সে কি করবে! না জানে সে কলকাতা শহরের কিছু, না চেনে কাউকে কলকাতায়।

একমাত্র পরিচিত। তার সেই মিশনারী হোস্টেলটা।

কিন্তু সেই হোস্টেলটা যে কোথায় তাও তো সে জানে না।

জীবনে গাড়িতে চেপে ছাড়া তো কখনো সে পায়ে হেঁটে রাস্তায়ই বের হয় নি।

বারো বছর পর্যন্ত ছিল সে দার্জিলিংয়ের এক কনভেণ্টে। তার পর সেখান থেকে এনে বাবা তাকে রেখেছিল কলকাতার ঐ মিশনারী হোস্টেলটায়।

বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে হোস্টেল এবং স্কুল। কোন ছাত্রীরই

বিশেষ করে হোস্টেলে যারা থাকত, স্কুল কম্পাউণ্ডের বাইরে যাবার কোন অধিকার ছিল না।

স্কুলের মেট্রন মিস্ হান্সয়ের তীক্ষ্ণ শাসন আর দৃষ্টি সর্বক্ষণ ওদের ঘিরে রেখেছে।

একবার করে শুধু গ্রীষ্মের ছুটিতে হয়তো বাবা বা দুষ্মন্ত গিয়ে তাকে নিয়ে আসত হোস্টেল থেকে।

সেও বালীগঞ্জের বাড়িতে তার ওঠা হত না। বাবা তাকে নিয়ে বের হয়ে পড়ত। কখনো গেছে নৈনী, কখনো মুসৌরী, কখনো শিলং, সিমলা—কাশ্মীর নানা জায়গায় বাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছুটিটা ঘুরে বেড়িয়েছে।

ঐ একটা বা দেড়টা মাস নলিনাক্ষ চৌধুরী—মধুছন্দার বাবা—মেয়েকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

আর ঐ একটা বা দেড়টা মাস নলিনাক্ষ চোধুরী তাঁর কাজকর্ম থেকে সম্পূর্ণ ছুটিও নিত।

দুষ্মন্তই সব কিছুই ঐ সময়টা দেখাশুনা করত।

বাবার মুখেই শুনেছে দুষ্মন্ত বাবার কি রকম দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের ছেলে—তার বাবার কাছেই মানুষ।

অথচ সেই দুষ্মন্তই আজ তার সবচাইতে বড় শত্রু।

আশ্চর্য! কখনো ঘুণাক্ষরে জানতেও পারে নি ঐ দুষ্মন্ত একটা এতবড় শয়তান।

তার মনের মধ্যে এমন দুরভিসন্ধি ছিল। তার বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর দুটো মাসও পার হতে না হতেই হঠাৎ তাকে কৌশলে রাঁচীর তাদের ভিলায় এনে অমন করে বন্দী করল।

কখন যে মধুছন্দার ক্লান্ত দু চোখের পাতায় ঘুম নেমে এসেছে ও টেরও পায় নি।

ঘুম যখন ভাঙল প্রখর রৌদ্রে সারা আকাশটা যেন ঝলসে যাচ্ছে। লরীটা চল্লিশ মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে।

প্রথমটা কিছুই মনে পড়ে না মধুছন্দার। ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকায়।

চওড়া মেটাল বাঁধানো রাস্তা ধরে লরীটা ছুটে চলেছে। দু পাশে মধ্যে মধ্যে গাছ। তারও ওদিকে খোলা প্রান্তর। মধ্যে মধ্যে দু চারটে বাড়ি ও গরু-মহিষ চোখে পড়ে।

সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা। মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। তুলতে পারছে না মাথাটা। একটা বস্তার উপরে মাথাটা রেখে পড়ে থাকে।

দুপুরের দিকে গাড়িটা একবার থামল রাস্তার ধারে।

মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ।

অনেক দোকানপাট লোকজনের ভিড় সেখানে। অনেক গাড়ি ও লরী এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িতে তেল-জল নেওয়া হল, গাড়ির ড্রাইভার ও অন্য দুজন লোক খেয়ে নিল, তার পর বেলা আড়াইটা নাগাদ আবার লরী ছাড়ল।

ক্ষুধায় পেটটা তখন চোঁ চোঁ করছে।

আকণ্ঠ তৃষ্ণায় গলাটা যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে।

মধ্যে মধ্যে এক একটা লেবেল ক্রসিং পড়ে, গাড়িটা থামে আবার গেট খোলা পেলে চলতে শুরু করে।

॥ ৪ ॥

বৌবাজার অঞ্চলে নানকিং হোটেল। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা হবে। হোটেলের পিছনের দিককার একটা ঘরে কতকগুলো লোক ফ্ল্যাস খেলছিল একটা বড় টেবিলের চারপাশে বসে।

কাঁচা টাকা আর নোটের স্তূপ টেবিলের উপর জমে উঠেছে। আর একটা কাঁচের পাত্রে সিগরেটের টুকরো স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সেই দলের ভিতর থেকে উঠে পড়ল একটি লোক, বললে,

আর না, চললাম। এবং কথাটা বলতে বলতে লোকটা টেবিলের উপরে তার সামনে যে নোট ও খুচরো টাকা জমা হয়েছিল সেগুলো মুঠো মুঠো করে তুলে প্যান্টের পকেটে ভরতে শুরু করে।

পাশ থেকে একজন বলে ওঠে, এই রাজা, বোস বোস—আর দু দান খেলে যা—

না—বাড়ি যাব, আবার সামনের শনিবার এসো খেলব। রাজা জবাব দেয়।

আর একজন মাঝখান থেকে টিপ্পনী কেটে বলে, এত তাড়া হুড়োই বা কিসের রাজা সাহেব বাড়ি ফিরবার, বাড়িতে তো আর কেউ থালা সাজিয়ে জানালা পথে তৃষিত নয়ন মেলে দাঁড়িয়ে নেই হে।

অন্য একজন জবাব দেয়, বলিস কি সুধীর, মেয়েমানুষ—জানিস না বুঝি রাজা সাহেবের আমাদের মটো—ত্যজ নারী সংসর্গ—

সেকি রাজা! সুধীর যেন বিস্ময়ে বড বড় চোখ করে এবার তাকাল রাজার দিকে, জীবনে অমৃতের স্বাদ থেকেই বঞ্চিত হয়ে রয়েছ।

রাজা তিক্ত হাসি হেসে এবার বলে, অমৃতই বটে—যাক্—চললাম হে—রাজা ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এবং ঘর থেকে বের হয়ে স্বল্প আলো-আঁধারী একটা সরু প্যাসেজের মধ্যে এসে পড়ে।

রাজা লোকটার বয়স ত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে হবে। লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশী হবে বলে মনে হয় না। বরং বেঁটে বলা উচিত। শরীরের গড়নটা কিন্তু খুব শক্ত। কালো গায়ের রঙ। মাথায় নিগ্রোদের মত ঘন কোঁকড়া চুল।

দেহটা বেঁটে এবং গায়ের রঙ কালো হলে কি হবে, রাজার মুখখানা কিন্তু যাকে বলে সুন্দরই। বিশেষ করে চোখ দুটি।

পরনে একটা ক্রীম রংয়ের ট্রপিক্যাল লংস্, গায়ে অনুরূপ একটা বুস কোর্ট।

প্যাসেজে এসে দাঁড়াল রাজা। এবং পকেট থেকে একটা রূপার সিগরেট কেস বের করে একটি সিগরেট ওষ্ঠে চেপে ধরে অন্য পকেট

থেকে লাইটারটা বের করে সিগরেটটা ধরাতে ধরাতেই ওর কানে এল একটা মৃদু পদশব্দ।

পদশব্দটা এদিকেই আসছে। হোটেলের চীনা মালিক লিংসিন্। লিংসিন্ সোজা এগিয়ে এসে রাজার মুখোমুখী একেবারে দাঁড়াল।

দীর্ঘদিন কলকাতা শহরে হোটেল চালিয়ে লিংসিন্ এখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে কথা বলতে পারে।

লিংসিন্ শুধায়, রাজাসাহেব গোয়িং ?

হ্যাঁ—বলে পকেটে হাত চালিয়ে দুটো দশ টাকার নোট বের করে লিংসিনের দিকে এগিয়ে ধরে, নাও।

লিংসিন্ বিনা বাক্যব্যয়ে নোট দুটো নিয়ে পকেটে ভরতে ভরতে নিঃশব্দে তার হলদে দাঁতগুলো বের করে হাসে।

চাচী ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি ? শুধায় রাজা।

হ্যাঁ—কেন বল তো ?

সোজা রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছিলাম। কয়েকটা চিংড়ি মাছের কাটলেট আর কয়েক পিস রুটি হলে মন্দ হত না।

কাটলেট কি আর আছে। আচ্ছা দাঁড়াও তুমি এখানে, আমি দেখে আসি কিচেন থেকে।

লিংসিন্ অন্ধকারে সরু প্যাসেজটার অন্যপ্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্ধকার প্যাসেজটার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজা সিগরেট ফুঁকতে থাকে।

প্রায় মিনিট পনের বাদে লিংসিন্ ফিরে আসে হাতে একটা কাগজের মোড়ক নিয়ে।

চিংড়ির কাটলেট নেই—মাংসের কাটলেট দুটো ছিল, আর দু পিস রুটি। এগিয়ে ধরে কথাটা বলে লিংসিন্ হাতের প্যাকেটটা রাজার দিকে।

রাজা ওর হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে নিজের পকেটে চালান করতে করতে বলে, দাও চাচা, আজ রাতটা না হয় তোমার হোটেলের মচা মাংসের কাটলেট দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাবে—

লিংসিন্ বলে ওঠে, না, না—পচা নয়—একেবারে ফাস্ট ক্লাস্ জিনিস। ওভেনের উপর বাটিতে ছিল, এখনো গরম আছে দেখো না।

তাই নাকি। তা বেশ—বেশ—বলে পা বাড়াচ্ছিল রাজা, পিছন থেকে লিংসিন্ বলে ওঠে, রাজা সাহেব, কাটলেটের দামটা?

ঘুরে দাঁড়ায় রাজা, দাম? হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভুলেই গিয়েছিলাম। তা কত দিতে হবে? চার আনা?

বল কি! ও হচ্ছে লিংসিনের রেস্তঁরায় স্পেশাল কাটলেট, বারো আনা করে এক একটা? একেবারে স্পেশাল।

বল কি একেবারে স্পেশাল? হ্যাঁ—টেস্ট্ করে দেখো।

তা বেশ—বলে পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে লিংসিনের হাতে দেয়, এবং বলে, টেস্ট্ করবার আগেই গন্ধতেই মালুম পাচ্ছি—কিন্তু চৈনিক রাজ, কতকাল আর এদেশে বসে আমাদের দাড়ি ওপড়াবে! এবারে কেটে পড়লেই তো পার।

হোয়াট—কি বললে?

বলছিলাম অনেক দিন তো হলদে রংয়ের বাঁদরের মত চ্যাপটা মুখ নিয়ে ভাই ভাই করলে—এ বারে বাই—বাই করে মানে মানে কেটে পড়ো, নইলে কোনদিন দেখবে জানতেও পারবে না নিজেই ভোঁ কাটা হয়ে জননী জাহ্নবীর সলিলে ভাসতে ভাসতে একেবারে ইয়াংসিকিয়াং নদীতে গিয়ে পড়বে—

কথাটা বলে রাজা আর দাঁড়ায় না।

সরু অন্ধকার প্যাসেজটা দিয়ে বের হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে একটা অপ্রশস্ত গলির মধ্যে এসে পড়ে। এবং গলিটা পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ে হাঁটতে শুরু করে।

অনেকটা পথ যেতে হবে। একটা ট্যাকসী পেলে মন্দ হত না, সেই লেক অঞ্চলে যেতে হবে।

তাছাড়া অনেকদিন পরে পকেটটা আজ মোটামুটি ভারী থাকায় মনটাও খুশী ছিল। মাত্র তিনটি টাকা নিয়ে সন্ধ্যায় খেলতে বসেছিল।

শ'দুই টাকা কয়েক ঘণ্টায় লাভ হয়েছে। কিছুদিনের মত এখন নিশ্চিন্ত।

কাজকর্মের যা মন্দা চলেছে। যুৎসই—বেশ মুখরোচক এমন একটা সংবাদ পাওয়া যায় না আজকাল যে বেচে বেশ কিছু—উপায় করবে।

দু চারটে কোথায় খুন হল বা কোথায় কি চুরি গেল সংবাদগুলো যেমন একঘেয়ে তেমনি যেন পচে গিয়েছে। ঐ সংবাদ সংগ্রহ করে তেমন একটা কিছু আর পাওয়া যায় না আজকাল।

তাই ভালও লাগে না আজকাল আর রাজার ঐ একঘেয়ে সব সংবাদের পিছনে ছুটোছুটি করতে।

বড় বড় ঘরের কেচ্ছা—কার বৌ কার সঙ্গে পালাল—কার বৌ সারা রাত কোথায় কোন নাইট ক্লাবে কাটাল—সব পুরানো পচা হয়ে গিয়েছে। কলকাতা শহরের অন্ধকার জগতের চোরাকারবারীদের চাঞ্চল্যকর আনাগোনা ব্যাপারটাও কেমন যেন ইদানীং একটু বেশীই সজাগ হয়ে পড়েছে।

কাজেই রাজার দিনরাত্রিগুলোও যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। কারণ রাজার কাজ হচ্ছে সংবাদ সরবরাহ করা কাগজে ও পুলিসের দপ্তরে। অবিশ্যি ওর সংবাদ সরবরাহ করার মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল এবং সেটা হচ্ছে উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে সে সংবাদ সরবরাহ করত।

অর্থাৎ আরো স্পষ্ট কথায় বলা চলতে পারে গোপন ও চাঞ্চল্যকর সংবাদের বেচা কেনাই ছিল তার আসল কারবার। এবং সেজন্য তাকে রীতিমত কষ্ট করে—অর্থাৎ পরিশ্রম করে এমন কি অনেক সময় জীবন বিপন্ন করেও তাকে সংবাদ নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে হত।

সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাকে সমাজের নানা স্তরে ঘুরে বেড়াতেও হত। ফলে যত্র তত্র যেমন তার গতিবিধি ছিল তেমনি পরিচয়ও গড়ে উঠেছিল সমাজের উপর তলা থেকে নীচের তলার লোকগুলির সঙ্গে -পর্যন্ত।

অবিশ্যি নিজস্ব সংবাদদাতা হিসাবে একদিন ঢুকেছিল রাজা 'বার্তাবহ' দৈনিক কাগজে, এবং বার্তাবহের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করতে করতেই একদিন যে কেমন করে কলকাতা শহরের ধনী ও অভিজাত মহলের গোপন কথা হোটেলে হোটেলে, ক্লাবে এবং রেস্তোরায় হানা দিতে দিতে সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল এবং সেইখান থেকে কখন যে যাতায়াত শুরু করেছিল কলকাতা শহরের অন্ধকার নীচের তলায় নিজেরও বুঝি তা মনে নেই। এবং টের পায় নি রাজা কখন ঐ ভাবে সব গোপন সংবাদ নিয়ে বেচাকেনা করতে করতে ঐ ব্যাপারে তার একটা নেশা ধরে গিয়েছিল।

আজ তাই শুধু যে নিছক অর্থের জন্যই গোপন সংবাদ দিয়ে বেচাকেনা করে ও তা নয়—বিচিত্র একটা আনন্দ ও রোমাঞ্চও যেন অনুভব করে ঐ কাজের মধ্যে রাজা।

অর্থাগম কিন্তু সব সময় নিয়মিত হত না। তার ফলে কখনো হয়তো পকেট থাকত ভারী কখনো একেবারে কর্পদকশূন্য।

সেজন্য অবিশ্যি মনে কোন খেদ ছিল না রাজার। বেপরোয়া বাউণ্ডুলে জীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

ঠাট বজায় রাখবার জন্য লেক অঞ্চলে তিনতলার উপর একটা দু কামরাওয়ালা সাজানো গোছানো ফ্ল্যাটও ছিল।

তবে রাত্রিবাস সে ফ্ল্যাটে বড় একটা তার ঘটে উঠত না।

গত কয়দিন ধরে রাজা একটা চোরা কারবারীর দলের পিছনে পিছনে ঘুরছিল কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারে নি।

সংবাদটা পাকাপাকি সংগ্রহ করতে পারলে অবিশ্যি মোটা রকমের একটা মুনাফার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কয়দিন ধরে রাজার ঘোরাই সার হয়েছে—লাভ কিছু হয় নি।

অথচ এদিকে কিছুদিন যাবৎ পকেট শূন্য।

তাই আজ শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনটি টাকা সম্বল করে লিংসিনের রেঁস্তোরার রাতের ফ্লাসের আড্ডায় গিয়ে হানা দিয়েছিল যদি কিছু উপার্জন করা যায়।

তা ভাগ্যক্রমে কয়েক ঘণ্টায় উপার্জনটা আজ রাজার মন্দ হয় নি।

গত কয়েকটা রাত ঘুমোয় নি পর্যন্ত রাজা। চোরা কারবারী দলটার পিছনে পিছনে ঘুরছিল।

আই তাই পকেটে ফ্লাস্ খেলে কিছু আসায় বাকী রাতটা ঘুমোবে ফ্ল্যাটে গিয়ে স্থির করে রাজা।

একটা ট্যাকসী পেলে মন্দ হত না। নচেৎ অনেকটা রাস্তা হেঁটে যেতে হবে। ভাবতে ভাবতে মধ্যরাত্রির জনশূন্য ফুটপাত ধরে হেঁটে চলে রাজা।

কিছুদূর চলবার পর মনে হয় পকেটে হোয়াইট লেবেলের ছোট বোতলটা আছে আর লিংসিনের কাছ থেকে কিনে আনা কাটলেট দুটোও আছে। এক ঢোক গলায় ঢেলে কাটলেট দুটো উদরস্থ করে নিলে কেমন হয়।

পথ চলতে চলতেই এদিক ওদিক তাকায় রাজা।

মেট্রো পার হয়ে পুরানো হোয়াইটওয়ের দোকানটার এখন যেখানে কে. এল. এম. এর এয়ার অফিস হয়েছে তার সামনে এসে দাঁড়াল রাজা।

প্রবেশ পথের সামনে যে সিঁড়ি সেই সিঁড়িটার উপর বসল।

অন্ধকার জায়গাটা।

বসে পকেট থেকে বোতলটা বের করে রাজা ছিপিটা খুলে প্রথমে নির্জলাই গলায় খানিকটা ঢেলে দিল। একটা তরল অগ্নি প্রবাহ গলনালী দিয়ে নীচের পাকস্থীতে চলে গেল।

অসহ্য ক্লান্তিতে শরীরটা যেন কেমন অবশ হয়ে আসছিল। ঐ তরল অগ্নিপ্রবাহ যেন সারা শরীরের স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে শরীরটাকে একটা নাড়া দেয়।

আরো খানিকটা ঢেলে দিল রাজা গলায়। আবার সেই অগ্নি-প্রবাহ গলনালীর সমস্ত ত্বক্‌কে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

তার পর যেমন পকেট থেকে কাগজ মোড়া কাটলেট দুটো বের

করতে যাবে, সহসা অন্ধকারে কে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একেবারে ওর পাশেই।

চম্‌কে ওঠে রাজা বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই!

প্যাকেটটা আর পকেট থেকে বের করা হয় না। থমকে যেন অন্ধকারে পাশে তাকায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারে উপবিষ্ট রাজার কোলের ওপর এসে পড়ে একখানা নরম হাত।

অবশ হয়ে যায় যেন সমস্ত অনুভূতিটা রাজার মুহূর্তের জন্য।

অন্ধকারে কিছু চোখেও পড়ে না। বোঝারও উপায় নেই।

তবু হাত দিয়ে কোলের ওপর থেকে হাতটা সরাতে চেষ্টা করতেই হাতটা যেন আঁকড়ে ধরে রাজার জঙ্ঘাটা।

নরম তুলতুলে একটা হাত।

॥ ৫ ॥

সারাটা দিন লরীটা একটানা ছুটে চলে সন্ধ্যার দিকে শ্রীরামপুর লেবেল ক্রসিং পার হয়।

মধুছন্দা যেন মরার মতই পড়ে ছিল লরীর উপর বোঝাই করা প্যাকিং বাক্সগুলির উপরে। একটিবারের জন্য মাথা পর্যন্ত তোলে নি পাছে কারো নজর পড়ে যায়, যতক্ষণ দিনের আলো ছিল।

ক্রমে যখন একটু একটু করে আলো নিভে গেল, চারিদিকে সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার ঘনিয়ে এল মধুছন্দা উঠে বসে।

একটানা মাল বোঝাই লরীটা ছুটে চলেছে।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে সমস্ত শরীর বিষের মত ব্যথা হয়ে গিয়েছে। আর যেন বসে থাকতে পারছে না। দেহের সমস্ত অস্থিসন্ধিগুলো যেন খুলে যাবার জোগাড়। পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়িগুলো দুপুর পর্যন্তও প্রচণ্ড একটা ক্ষুধার যন্ত্রণায় পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছিল।

সন্ধ্যার পর থেকে যেন সেই যন্ত্রণাবোধটা কেমন একটু একটু করে

কখন অবশ হয়ে আসে। এখন শুধু মনে হয় মধুছন্দার এই অসহ্য দুলুনীর হাত থেকে একটু নিষ্কৃতি পেলে বুঝি সে সত্যিই বেঁচে যেত।

লরীর উপরে নিজের উপস্থিতিটা যে জানান দেবে সকলকে তারও উপায় নেই। প্রথমতঃ ঐভাবে লরীর উপর তার উপস্থিতিটা জানা জানি হয়ে গেলে তার আর পালানো তো হবেই না দ্বিতীয়তঃ সঙ্গে সঙ্গে হয়তো চার পাশ থেকে নানা কণ্ঠে সাত-সতের প্রশ্ন বর্ষণ শুরু হয়ে যাবে।

তার পর যখন জানতে পারবে আসলে সে পুরুষের মত করে শাড়িটা মালকোচা দিয়ে পরে থাকলেও সে পুরুষ নয়, একটি মেয়ে, সকলের কৌতূহল তখন আরো মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াবে।

কে তুমি? কোথা থেকে আসছ?

মাল বোঝাই লরীটার উপর ছিলে কেন?

পুরুষের মত করে কাপড়ই বা পরেছিলে কেন?

বাড়ি থেকে পালাচ্ছ কেন?

বাবার নাম কি? কোথায় বাড়ি?

তার পরই হয়তো নিয়ে গিয়ে তুলে দেবে পুলিসের হাতে।

পুলিসের হাতে তুলে দেওয়াই মানে আবার সেই শয়তান দুষ্মন্তটার খপ্পরে।

পুলিসকে নিজে সত্য কথা বললেও হয়তো তারা তার কথা বিশ্বাস করবে না। তার পর দুষ্মন্ত যখন তার ডাক্তারের দল নিয়ে এসে প্রমাণ করবে আসলে সে সুস্থই নয়। গত দু বছর ধরে মস্তিকের অসুস্থতায় ভুগছে। বাড়িতে নজরবন্দী ছিল, সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। আবার সকলে মিলে তখন তাকে সেই ঘরেই নিয়ে গিয়ে বন্দী করবে।

না, না, না—

কথাটা ভাবতেও যেন শিউরে ওঠে মধুছন্দা।

আবার সুস্থ থেকেও পাগল—আবার সেই দিনের পর দিন রাতের পর রাত বন্দী-জীবন, নচেৎ শয়তান দুষ্মন্তকে বিয়ে করা।

না। কোনটাই সে আর পারবে না।

পারবে না সে ফিরে গিয়ে পাগল হয়ে আবার নিজের বাড়িতেই বন্দিনী হয়ে থাকতে। কিংবা দুষ্মন্তর গলায় মালা দিতে।

তার চাইতে এই অনিশ্চয়তাই ভাল।

চার দেওয়ালে ঘেরা সেই ঘরটা আর ডাইনী সেই কাটারীয়ার দৃষ্টি — তিল তিল করে সেই শ্বাসরোধকারী অপমৃত্যু।

না, আর কিছুতেই প্রাণ থাকতে সে তার মধ্যে ফিরে যাবে না।

মাথা তুলে বেশীক্ষণ তাকাতে এদিক ওদিক সাহসও হয় না মধুছন্দার। আবার শুয়ে পড়ে প্যাকিং বাক্সগুলোর ওপর।

অসহায় ওর দেহটা নিয়ে যেন ছুটন্ত লরীটা লোফালুফি করছে।

ক্রমে বালী, কোন্নগর—উত্তরপাড়া পার হয়ে আসে লরীটা।

অন্ধকার বেশ চারিদিকে জমাট বেঁধে উঠেছে। গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে চওড়া মেটাল বাঁধানো রাস্তা। গঙ্গার ওপারে আলোর সারি চোখে পড়ে।

মাথার উপরে রাত্রির আকাশ নক্ষত্রখচিত।

রাত প্রায় বারোটা নাগাদ লরীটা স্ট্রাণ্ড রোডের আবছায়া অন্ধকারে একটা গোডাউনের সামনে এসে দাঁড়াল।

সামনেই একটা করোগেটেড সীটের ভারী মজবুত গেট।

গেটের মাথায় স্বল্প শক্তির একটা বিদ্যুৎ বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। স্বল্প আলোয় ও অন্ধকারে যেন একটা আলো-আঁধারির সৃষ্টি করছে আশেপাশে।

লরী থেকে একটা লোক নেমে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করতেই গেটেরই এক পাশে একটা চৌকো অংশ খুলে একটা লোক বের হয়ে এল।

লরীর লোক দুটোর সঙ্গে ও সেই আগন্তুকের নিম্নকণ্ঠে যেন কি কথাবার্তা হল, তার পরই সেই আগন্তুক গেটের তালা খুলে দিল।

এবং তালাটা খুলে বিরাট গেটের পাল্লা দুটো তিনজন মিলে ঠেলে যখন খুলতে ব্যস্ত সেই ফাঁকে লরীর উপর থেকে নেমে পড়ল মধুছন্দা।

লরী থেকে নেমে অন্ধকারে অন্ধকারে সারি সারি বিরাট বাড়ি-গুলোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

কোথায় চলেছে জানে না মধুছন্দা।

চেনেও না রাস্তাটা।

দার্জিলিং কনভেণ্ট থেকে এসে কলকাতায় ক্রিশ্চান মিশনারীদের হোস্টেলে দুটো বছর ছিল বটে মধুছন্দা কিন্তু হোস্টেলের বাইরে তো সে কখনো পা দেয় নি।

হোস্টেলের কড়া নিয়মে বাহিরে যাবার কখনো উপায় ছিল না। বছরে এক আধবার বাইরে বের হয়েছে; সেও দল বেঁধে হোস্টেলের বাসে চেপে হোস্টেলের নেট্রনের তত্ত্বাবধানে এবং তাও বোটানিকস্ জু'তে পিকনিক করতে।

বাসে চেপে যেতে যেতে দু পাশের কলকাতা শহরের সঙ্গে সেই যা তার চোখের পরিচয়।

কলকাতা শহরের কিছুই তো জানে না মধুছন্দা। না জানে কোন রাস্তাঘাট—না চেনে কোন জায়গা বা জানে কোন জায়গার বা রাস্তার নাম।

বিরাট শহরটা কোথায় কি! কোন জায়গার কি নাম বা কোন রাস্তা ধরে কোথায় কোন অঞ্চলে যাওয়া যায়। কিছুই তো মধুছন্দার জানা নেই।

তাই বুঝি অন্ধের মতই সামনের দিকে হেঁটে চলে।

মধ্যে মধ্যে দু একটা প্রাইভেট গাড়ি বা লরী রাস্তা কাঁপিয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে হেড-লাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে।

পাছে কারো নজরে পড়ে যায়, তাই যথাসম্ভব বড় বড় বাড়ি-গুলোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে এগোয় মধুছন্দা।

কিন্তু অনাহারে ও গাড়ির একটানা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ক্লান্ত শরীরটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। হাঁটতে গিয়ে পায় পায় জড়িয়ে যায়। মনে হয় মধুছন্দার আর বুঝি সে চলতে পারছে না, শরীরটা এখুনি রাস্তার উপরেই ভেঙ্গে পড়বে।

একে জীবনে কোনদিন তেমন হাঁটা অভ্যাস নেই মধুছন্দার তার উপরে দু বছর ছিল ঘরের মধ্যে বন্দী। স্বাভাবিক পায়ে হাঁটার শক্তিটুকু পর্যন্ত যেন সে আজ হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু তবু চলতে হবে। রাস্তার উপরে থামলে তো চলবে না।

একটা যা হোক নিশ্চিন্ত আশ্রয় যেখানে হোক চাই অন্তত এই শ্রান্ত অবশ দেহটা নিশ্চিন্তে এলিয়ে দিতে পারবে যেখানে।

কিন্তু সে আশ্রয় কোথায় মিলবে তার।

মনে হয়েছিল কলকাতায় এসে একবার কোনমতে পৌঁছতে পারলে যা হোক একটা আশ্রয় সে নিশ্চয়ই খুঁজে নিতে পারবে।

ঐ কথাটাই সে চলন্ত লরীর উপর শুয়ে শুয়ে ভেবেছে এতক্ষণ।

কিন্তু এখন কলকাতায় পৌঁছে মনে হচ্ছে কোথায় সেই আশ্রয়। কোথায় পাবে সে আশ্রয়।

হেঁটে চলে আর মনে মনে ভাববার চেষ্টা করে মধুছন্দা, কোথায় সে আশ্রয়। পরিচিত কাউকেই তার মনে তো কই পড়ছে না।

স্ট্রাণ্ড রোড ধরে গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে হেঁটে চলে মধুছন্দা। গঙ্গার ওপারে অন্ধকার আলোগুলো মিটি মিটি জ্বলছে। একটা ছোট স্টীমার সিটি দিয়ে চলে গেল।

ঝির ঝির করে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে মুখে এসে ঝাপটা দেয়।

অবাধ্য ক্লান্ত চোখের পাতা দুটো যেন নেমে আসতে চায়, বুজে আসতে চায়।

উঃ কি ঘুম যে পাচ্ছে মধুছন্দার। দু চোখ ভরে গাঢ় ঘুম যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়।

ক্লান্ত অবসন্ন দুটো পা টেনে টেনে একসময় মধুছন্দা মেট্রোর কাছাকাছি এসে হাজির হয়।

রাত প্রায় সাড়ে বারোটা কি পৌণে একটা হল।

মধ্যরাতের চৌরঙ্গী তখন আলোর উৎসব নিভিয়ে দিয়েছে। শুধু জ্বলছে রাস্তার দুধারে বাকী রাতের মত লাইটপোস্টের আলোগুলো।

কালো মেটাল বাঁধানো প্রশস্ত পথটা তো নয়, যেন একটা অজগর মধ্যরাতের নিঃসঙ্গ স্তব্ধতায় গা এলিয়ে পড়ে আছে।

ক্বচিৎ এক আধটা গাড়ি বা প্রাইভেট ট্যাক্সী ঐ নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে যেন ক্ষণিকের একটা শব্দের তরঙ্গ তুলে চলে যায়।

ঠুং ঠুং ঠুং একটা রিক্সা ক্লান্ত গতিতে চলে গেল।

কিন্তু আর তো এক পাও হাঁটতে পারছে না মধুছন্দা।

পা দুটো যেন অবশ। লোহার মত ভারী। আর যেন কিছুতেই পারছে না মধুছন্দা।

পুরাতন হোয়াইটওয়ের এবং এখনকার কে. এল. এম. এর দরজার সামনে চওড়া সিঁড়িটার উপর বসে পড়ল মধুছন্দা।

অন্ধকার জায়গাটা। সিঁড়ির পাশের দেওয়ালটায় প্রথমে হেলান দেয়—চোখ দুটো আপনা হতেই বুজে আসে। দেহটা যেন একতাল কাদার মত সিঁড়ির একপাশে গড়িয়ে পড়ে।

ঘুম আসে দু চোখ ভরে।

॥ ৬ ॥

হাতটা রাজা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই সেটা আরও যেন নিবিড় করে তার হাঁটুটা জড়িয়ে ধরল অন্ধকারে।

নরম তুলতুলে সেই হাতটা।

এই কে—এই—বলে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে রাজা আবার হাতটা।

কিন্তু অন্য পক্ষের কোন সাড়া নেই।

সেই নরম তুলতুলে হাতটা তার হাঁটুটা এমন করে আঁকড়ে ধরেছে, উঠে দাঁড়াবে যে রাজা তারও উপায় নেই।

রীতিমত বিরক্তই হয়ে ওঠে রাজা। এই মাঝ রাত্রে এ আবার কি ঝামেলা।

রাজা আর দ্বিধা করে না। সবল হাত দিয়ে বেশ জোর করেই যে হাতটা তার জঙ্ঘাটা আঁকড়ে ধরেছিল সেই হাতটা খুলে ঠেলে দেয় একপাশে।

কিন্তু হাতটা একপাশে ঠেলে দিলে কি হবে, এবার গোটা শরীরটাই গড়িয়ে এসে যেন তার গায়ের উপরে পড়ল।

আচ্ছা জ্বালাতনে পড়া গেল তো—বিড় বিড় করে সবে জমাট বাঁধা নেশার ঘোরে হাত দিয়ে সেই দেহটাকে ঠেলবার চেষ্টা করে বিরক্ত ভরা কণ্ঠে বলে, কে—এই—এই—

সাড়া নেই অন্যপক্ষের কোনো।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু তাও পারে না।

জামাটা চাপা পড়েছে।

এবার আর রাগ সামলাতে পারে না রাজা। সবল দু হাতে যে নিশ্চল দেহটা তার গায়ের সঙ্গে প্রায় লেগে ছিল সেই দেহটা তুলে—তাকে বসিয়ে দেয়।

কিন্তু বসালে কি হবে ঘুমন্ত দেহটা অসহায়ভাবে তার বুকের উপর টলে পড়ে।

আর ঠিক সেই সময়ে মচ্ মচ্ মচ্ এক জোড়া ভারী জুতোর শব্দ শোনা যায়। মচ্ মচ্ মচ্—ভারী জুতোর শব্দটা অন্ধকারে ঐ দিকেই এগিয়ে আসছে।

রাজা হতভম্ব হয়ে নির্বাক বসে থাকে।

তার বুকের উপরে ততক্ষণে একটা ঘুমন্ত দেহ এলিয়ে রয়েছে।

ঘুমন্ত দেহটাকে আবার বুকের উপর থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে যাবে রাজা আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা টর্চের জোরাল আলোর ঝাপটা ওর সর্বাঙ্গে এসে পড়ে।

একটা ভারী গলায় প্রশ্ন ভেসে আসে, কৌন!

সর্বনাশ।

এ যে পুলিস।

রাজা তখন বোবা। একেবারে পাথর।

ভারী জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ আরো একটু কাছে এগিয়ে এল, এই হিয়া আঁধারীমে তুমলোক কেয়া করতা হ্যায়।

সংবাদ সংগ্রহের আশায় যেদিন থেকে রাজা শহরের অন্ধকার চোরা গলি ঘুঁজিতে ঘুরতে শুরু করেছিল তারই কিছুদিন পর থেকে সে লক্ষ্য করছে মধ্যে মধ্যে কারা যেন তাকে দূর থেকে অনুসরণ করে। তাই এত রাত্রে পুলিসের জেরার মধ্যে পড়তে রাজার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু ঘুমন্ত লোকটা তার গায়ের উপর এমনভাবে হেলে আছে যে তাকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ানও যেমন কষ্টকর তেমনি ঐভাবে একটা লোক এই রকম জায়গায় এত রাত্রে তার গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে, সে যে তার কেউ নয় এবং তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার, সে কথাটাও ঐ পুলিসকে অত সহজে বোঝানো কষ্টকর।

অতঃপর ঐ অবস্থায় কি যে সে করতে পারে তাও রাজার মাথায় আসে না।

পুলিস তাদের উপরে তখনো হাতের আলোর ফোকাসটা ধরেই রয়েছে এবং ধরে থাকতে থাকতেই আবার প্রশ্ন করে, কিউ! বাত নেহি করতা কিউ! কেয়া—তোমরা সাথ্‌মে তো জেনানা মালুম হোতা হ্যায়—

জেনানা!

ধক্ করে ওঠে বুকের ভিতরে রাজার। বলে কি রে বাবা। জেনানা কি?

ইতিমধ্যে তার গায়ের উপরে ঘুমন্ত মধুছন্দার মাথার পাগড়িটা যে খুলে পড়েছে এবং তার চুলগুলো গুচ্ছে গুচ্ছে কাঁধের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে রাজা জানতেও পারে নি।

কিন্তু সেই চুল কেটে মধুছন্দা অনেকটা ছোট করে ফেললেও, পুলিসটার সন্দেহ হয় এবং ভাল করে দেখলেই একটু বুঝতে পারে—পুরুষের মত করে কাপড় পরে থাকলেও সে পুরুষ নয়—নারী।

পুলিসটা আবার প্রশ্ন করে, কৌন হ্যায় ও তোমরা সাথ ছোকরী —সাচ বাতাও—মালুম হোতা হ্যায় ও ছোকরী মাতোয়ালা—

রাজা ততক্ষণে তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে মনে মনে।

বোকার মতই পুলিসটার দিকে চেয়ে একগাল সে হেসে ফেলে, হ্যাঁ সেপাইজী, তুমিই ঠিকই ধরেছ। ও আমার গার্ল ফ্রেণ্ড। মানে ফিঁয়াসে—

ফিঁয়াসে! ও কেয়া হ্যায়! পুলিস পুনরায় শুধোয়।

ফিঁয়াসে জানতা নেহি হ্যায়! যিসকো প্রেমিকা—মানে দিল কা রানী বোলতা হ্যায়।

আচ্ছা। এহি বাত। তা ইধার কাহে!

রাজা মুহূর্তকাল চিন্তা করে—তার পরই কর করে একটা দশ টাকার নোট পুলিসটার দিকে এগিয়ে দেয।

পুলিসটাও নির্বিবাদে সেটা আত্মসাৎ করে।

বাজা তখন বলে, ইধার কি আর সাধ করকে আয়া হ্যায়। দোনো ঘুমতে ঘুমতে থক্ গিযা—রাত ভি বহুত হোগিয়া—একঠো ট্যাক্সী ভি নেহি মিলা—ওহি বাস্তে ইধার বৈঠকে থোড়া সে আরাম করতা থা—

পুলিস আবার খিঁচিয়ে ওঠে, আরাম করনে জায়গা ই নেহি হ্যায় কোঠিমে যাও—নেহি তো হাজতমে—

নেই—নেই সাব্—একঠো ট্যাক্সী বা রিক্সা মিলনেসে—বলতে বলতে আর একটা দশটাকার নোট পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দেয় রাজা।

এতক্ষণে বোধ করি পুলিসটার মনটা নরম হয়।

সে বলে, যায়গা কিধার?

বালীগঞ্জ!

দুর্ভাগ্যেই হোক বা সৌভাগ্যেই হোক দেখা গেল ঠিক ঐ সময় একটা ট্যাক্সী রাস্তা দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলেছে।

পুলিসটাই চেঁচিয়ে ট্যাক্সীটাকে দাঁড় করায়।

রাজা তখন মধুছন্দাকে কোনমতে তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে, ওগো সুন্দরী, এবারে ওঠো—গাত্রোত্থান করো—নচেৎ দু জনকেই শ্রীঘর বাস করতে হবে—

কিন্তু সাড়া নেই কোন মধুছন্দার।

এবারে বেশ জোরেই ঝাঁকি দেয় রাজা। কোন মতে এবারে ঘুমজড়িত কণ্ঠে মধুছন্দা জবাব দেয়, য়্যাঁ—কে।

ন্যাকামী রাখো। চলো তো—ট্যাক্সীতে—

ট্যাক্সী!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—চলো—ভাল ফ্যাসাদে পড়ে গেছি রে বাবা। চলো—চলো—

অতঃপর কোনমতে রাজার কাঁধেই ভর দিয়ে ট্যাক্সীতে গিয়ে উঠে মধুছন্দা এবং উঠেই আবার রাজার গায়ে এলিয়ে পড়ে।

ট্যাক্সীওয়ালা শুধায়, কিধার জায়গা সাব্?

রাজার একবার ইচ্ছা হল বলে, যমালয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলে, সিধা—বালীগঞ্জ।

আবার সেই জাপটে ধরার জোগাড় রাজাকে গাড়ির মধ্যেও।

ট্যাক্সী ড্রাইভারটা সামনে বসে গাড়ি চালাচ্ছে, চেঁচামেচি করবার উপায় নেই—তবু যতটা সম্ভব ঠেলে ঠেলে গায়ের উপর থেকে মধুছন্দাতে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে রাজা।

কিন্তু যেন একেবারে জোঁকের মতই গায়ে লেপটে আছে মেয়েটা।

আশ্চর্য! কি ঘুম রে বাবা। একেবারে হুঁশ বলতে কিছু নেই।

কিন্তু এই আপদকে সঙ্গে করে নিয়ে রাজা যাবেই বা কোথায়। নিজের ফ্লাটে! মাথা তো খারাপ হয় নি।

ঠিক আছে, মনে মনে ভাবে পথের মাঝে কোথাও নামিয়ে দিতে হবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় নামাতে গেলে যদি ট্যাক্সী ড্রাইভারটা সন্দেহ করে।

তার চাইতে এক কাজ কয়লে তো হয়। পথের মাঝে ও নেমে যাবে আর ট্যাক্‌সী ড্রাইভার ওকে যেখানে খুশী ওর নামিয়ে দিক।

মতলবটা মাথায় আসবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা বলে ওঠে, রোক্‌কে—রোক্‌কে—

ট্যাক্‌সী ড্রাইভার ট্যাক্‌সী থামায়।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা ট্যাক্‌সী থেকে নেমে পড়ে।

সামনেই চোখে পড়ে চড়কডাঙ্গার মোড়। পকেট থেকে দশ টাকার দুটো নোট বের করে ট্যাক্‌সী ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, এই লেও হাম ভাড়া দে দেতা হ্যায়—যিধার ঐ লেড়কী উতরানে মাংগতা উতার দে না—

কথাটা বলেই এবং ট্যাক্‌সী ড্রাইভারের হাতে নোট দুটো গুঁজে দিয়ে কোনমতে রাজা পা বাড়িয়েছিল যাবার জন্যে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারটা পিছু এসে ডাকে, আরে শুনিয়ে শুনিয়ে বাবুজী—এ নেহী হোগা—

কেয়া নেহি হোগা?

ও আপনার লোক—আপনি উতরিয়ে দেবেন চলুন—

কেন? ও যেখানে যেতে চায় পৌঁছায় দেও না।

নেহি বাবুজি। উ কাম হামসে নেহি হোগা। মাতোয়ালা ছোকরী—এতনা রাতমে—কিউ হাম কি ফাস জায়গা?

ফেঁসে যাবে কেন বাবা। ও ঠিক ওর বাড়ির ঠিকানা বলে দেবে। একটু দারু পিয়েছে বটে, তবে হুঁশ পুরোপুরি আছে—কথা বোলকে দেখো না।

নেহি বাবুজী, নেহি—আপ ট্যাক্‌সীমে উঠিয়ে। আপকো ছোকরী আপনি সামলান। চলেন উঠুন—

কি বললে?

বলতা হ্যায় আপকো ছোকরি—আপই সামলাইয়ে—

আমার ছোকরি—

তব্ নেহি তো কি হামারা? উঠিয়ে বাবুজী চলিয়ে—নেহি তো পুলিস বোলায়েঙ্গে—চলেন—

অগত্যা আর উপায় কি! সুবোধ বালকটির মত রাজা আবার ট্যাক্সীতে উঠে বসে।

কিধার জানা বোলিয়ে।

বালীগঞ্জ লেক টেরেস—

গাড়ি আবার ছুটে চলল।

একটা অন্ধ আক্রোশে ও নিরুপায়তার যেন সর্বাঙ্গ রাজার জ্বলতে থাকে। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল তো।

এক একবার ইচ্ছা করে ঠাস্ করে একটা চড় কসিয়ে দেয় ঘুমন্ত মেয়েটার গালে। কিম্বা গাড়ির দরজা খুলে একটা ধাক্কা দিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেয়। কিন্তু কোনটাই করতে পারে না রাজা।

মেয়েটা সীটের উপর পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

একবার মনে হয় রাজার, সত্যিই ঘুমোচ্ছে মেয়েটা না—সব কিছু শয়তানী—ঘুমের ভান করে আছে।

আবার মনে হয় তাই বা কি করে সম্ভব। ঘুমোচ্ছেই বটে। কিন্তু এযে সত্যিই কুম্ভকর্ণের ঘুম। এমন ঘুম রাজা জীবনে দেখে নি।

হতাশ হয়েই বাইরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মনে মনে নতুন মতলব আঁটে।

ট্যাক্সীটাকে বিদায় করে পথের উপরেই ঐ আপদটাকে ফেলে সোজা চলে যাবে নিজের ফ্ল্যাটে।

কিন্তু অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।

গাড়ি থেকে নেমে সবে ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছে, রাজার নজরে পড়ল অল্প দূরেই দুটো পুলিস লাঠি হাতে ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ঘুমন্ত মধুছন্দাকে ধরে ধরে কোনমতে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে রাজা।

চারতলা বিরাট ফ্ল্যাট্ বাড়িটার তিনতলার একটা সিংগিল ফ্ল্যাটে রাজার ডেরা।

অন্যান্য দিন দরোয়ানটা ঐ সময় ঘুমোয়, সেদিন বেটা জেগে বসে কার সঙ্গে যেন গল্প করছে অত রাত্রেও।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে সিঁড়ি দিয়ে ঘুমন্ত মধুছন্দাকে ধরে ধরে তিন তলায় উঠে যায় রাজা।

দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে।

একটিমাত্র মাঝারি সাইজের ঘর—সেটাই বসবার এবং শোবার। আব পাশেব ঘরটা ছোট বলে সেটা রাজা ডাইনিং হল ও ড্রেসিং রুম করে নিয়েছিল।

শয্যাও একটি।

একটা সোফা ছিল শয্যার পাশে, তার উপরেই রাজা মধুছন্দাকে বসিয়ে দেয় এবং বসবার পর এতক্ষণে আলোয় মধুছন্দার মুখখানা তাব নজরে পড়ে।

ঘাড়টা চেয়ারের ব্যাকে হেলিয়ে দিয়েছে। ছোট ছোট ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পশমের মত চুল মুখের দিক একটা ও চোখে ঢেকে দিয়েছে। যে চোখটি দেখা যাচ্ছে সেটাও বোজা। একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য যেন মুখখানিতে।

নিজের অজ্ঞাতেই কয়েকটা মুহূর্তের জন্য চুলে আধো ঢাকা আধো খোলা মুখখানির দিকে চেয়ে থাকে রাজা!

শুধু সৌন্দর্য নয়—তার সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে অসহায় একটা ক্লান্তি।

মনে মনে ভাবে থাক রাতটা ঘরে। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে বিদায় করে দিলেই হবে গলা ধাক্কা দিয়ে।

তা ছাড়া নিজেরও ঘুম পেয়েছিল রাজার।

তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে ঢুকে কাপড়জামা ছেড়ে, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ঘরের শয্যার উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে রাজা।

চার পাঁচ রাত ঘুমোয় নি, শয্যায় গা ঢেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাক ডাকতে শুরু করে।

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙ্গল রাজার সমস্ত ঘরটা রোদে ভরে গিয়েছে।

উঃ অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে!

ধড়ফড় করে শয্যার উপর উঠে বসে রাজা।

এবং উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের মেঝেতে নজর পড়ে গত রাত্রের সেই মেয়েটি কখন চেয়ার থেকে বোধ করি ঘুমের মধ্যে মেঝেতে পড়ে গিয়েছে, মেঝেতেই ধুলোবালির মধ্যে তখনো ঘুমোচ্ছে গুটিসুটি হয়ে পরম নিশ্চিন্তে।

শেষ রাত্রের দিকে আজকাল ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। শীত বোধ হওয়ায় বোধ হয় গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়ে আছে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় রাজার গত রাত্রির ঘটনা।

গত রাত্রে ব্যাপারটা ভাল করে থিতিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে নি। তাছাড়া খালি পেটে কিছু তরল অগ্নি পড়েছিল, ভাববার মত মস্তিষ্কও ছিল না।

এখন ভাল করে ভেবে দেখবার চেষ্টা করে ব্যাপারটা রাজা।

মেয়েটির মুখের চেহারা দেখেই স্পষ্টই বোঝা যায় কোন নীচু ঘরের বা সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়। কোন অভিজাত ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়।

ঐ সময় হঠাৎ রাজার নজর পড়ে মেয়েটির হাতের আংটিটার প্রতি।

শয্যা থেকে উঠে এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে আংটিটা আঙ্গুলের পরীক্ষা করতেই রাজা বুঝতে পারে সেটা সাধারণ কোন পাথরের আংটি নয়। দামী হীরার আংটি।

হাতের আঙুলে হীরার আংটি যখন রয়েছে নিশ্চয়ই কোন বড় ঘরের মেয়ে।

কিন্তু কাল রাত্রে অমন জায়গায়— ঘুমোচ্ছিল কেন!

আর পরিধেয় শাড়িটা পুরুষের মত করেই বা পরা কেন আর মাথায়ই বা পাগড়ি বাঁধা ছিল কেন! বাড়ি থেকে পালায় নি তো মেয়েটা।

আশ্চর্য নয়, হয়তো কোন বড়লোকের আদুরে মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে কাউকে কিছু না বলে। বয়সও তো খুব একটা বেশী বলে মনে হয় না রাজার। উনিশ কুড়ির মধ্যেই হবে।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল শয্যা থেকে রাজা এবং মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, তার পর আলনা থেকে একটা বেডকভার টেনে নিয়ে ঘুমন্ত মেয়েটির গায়ের উপর দিয়ে দিল।

মেয়েটি কিন্তু নড়লও না শব্দও করল না। যেমন ঘুমোচ্ছিল তেমনি ঘুমোতে লাগল।

কাল সারাটা রাত বলতে গেলে উপোস গিয়েছে। পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করছে।

পাশের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে রাজা হাতমুখ ধুয়ে ইলেকট্রিক স্টোভে কেতলীতে করে চায়ের জল চাপিয়ে দিল।

একা মানুষ হলেও রাজার ঘরে সব রকম ব্যবস্থাই মজুত থাকে। কারণ মধ্যে মধ্যে এমনও হয় যে একটা অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তা ও আলসেমি যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

এবং সেই আচ্ছন্নতা এক এক সময় তার আট-দশ দিন পর্যন্ত থাকে। ঐ সময়টা কোথায়ও বের হয় না।

ফ্ল্যাটের ঐ ঘরটার মধ্যেই শুয়ে শুয়ে দিবারাত্র যত রাজ্যের ডিটেকটিভ নভেল পড়ে কাটিয়ে দেয়।

ইলেকট্রিক স্টোভেই নিজে যা পারে সামান্য কিছু তৈরী করে তাতেই কাজ চালিয়ে নেয়।

ঘরে সেই কারণেই টুকটাক খাবার জিনিস সর্বদাই রাজা মজুত রাখে।

ইলেকট্রিক স্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে ডিমের টিনটা হাতড়ে দেখল তার মধ্যে ডিম এক আধটা আছে কিনা।

কিন্তু না, শূন্য টিন।

তবে বিস্কুটের টিনটা ভর্তিই আছে দেখা গেল।

জ্যাম, জেলি মাখনও আছে। কনডেনসড মিল্কও টিনে আছে।

অতএব ব্রেকফাস্টটা এক রকম সেরে নেওয়া যাবে।

কেতলীতে জল ফুটতেই চায়ের পাতা ছেড়ে দিল রাজা।

চা'টা ভিজুক—ততক্ষণে মুখ ভর্তি দাঁড়ি—তিন-চারদিন সেভ করার সময় পায় নি রাজা, বাথরুমে গিয়ে সেভ করে নিল।

তোয়ালেতে মুখটা মুছে চায়ের কাপে চা ঢালতে গিয়ে হঠাৎ পাশের ঘরের মেয়েটির কথা রাজার মনে পড়ে যায়।

মেয়েটাকে এবারে ঘুম থেকে ডেকে তুললে কেমন হয়।

মেয়েটারও পেটে কাল সারাটা রাত কিছু পড়েছে কি না কে জানে। হয়তো তারই মত বলতে গেলে উপবাসে কেটেছে।

ডেকে তুলে এক কাপ চা দেবে নাকি।

দুটো বিস্কুট সেই সঙ্গে।

পরক্ষণেই আবার মনে হয়, মরুকগে, উপবাসে আছে তো তার কি? উড়ো আপদ কোথা থেকে কাল রাত্রে ঘাড়ে এসে জুটেছে, রাতটা থাকতে দিয়েছি, এখন ঠেলে তুলে বিদায় করে দিলেই তো হয়।

যাও বাবা, এটা তোমার কোন পরমাত্মীয়ের বাড়িও নয়, হোটেলও নয়। এখান থেকে এবারে সরে পড়ো।

রাজা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সোজা গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা যেখানে মেঝেতে বেডকভারটা জড়িয়ে তখনো একটানা নিদ্রা দিচ্ছে।

আশ্চর্য! কি ঘুম রে বাবা! এখনো দিব্বি ঘুমোচ্ছে।

রাজা ডাকে, শুনছেন—এই—উঠুন—উঠুন—

কোন সাড়া নেই অপর পক্ষের।

শুনছেন ? এবারে গায়ে হাত দিয়ে ডাকে রাজা।

নড়া চড়া করল একটু তার পর ঘুম জড়িত কণ্ঠে চোখ বুজে বুজেই কি যেন বিড় বিড় করে বলে।

শুনছেন ?

এবারে মেয়েটির ঘুম জড়িত কণ্ঠস্বর হলেও খানিকটা স্পষ্ট হয়ে রাজার কানে প্রবেশ করল।

চা এনেছিস—রাখ টেবিলে।

উঃ নবাব নন্দিনীরে আমার—হুকুম দেওয়া হচ্ছে আবার চা এনেছিস—রাখ টেবিলে। উঠুন—উঠুন—

কণ্ঠস্বরটা একটু বেশ চড়াই হয় রাজার। একটু একটু করে একবার তাকাল মেয়েটি।

উঠুন—উঠে বসুন—শুনছেন ?

মধুছন্দা ধীরে ধীরে উঠে বসল।

রাজার মুখের দিকে যেন বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে তার পর প্রশ্ন করে, আপনি—আপনি কে ?

মধুছন্দার অসহায়—সরল চোখের দৃষ্টি ও সোজা সরল প্রশ্নে কি জানি কেন হঠাৎ রাজার হাসি পেয়ে যায়।

মধুছন্দা আবার প্রশ্ন করে, আপনি কে ?

তার আগে বলুন তো আপনি কে ?

আমি ?

হ্যাঁ—

আমি—

তাও বোধ হয় মনে পড়ছে না। তা না পড়বারই কথা। কাল রাত থেকে যা ঘুমের বহর দেখছি ! একেবারে কুম্ভকর্ণ দি সেকেণ্ড—

মধুছন্দা চুপ করে থাকে।

ঘুমের ঔষুধটৌষুধ খেয়েছিলেন নাকি কিছু ?

মধুছন্দা এবারেও চুপ।

কেবল নিঃশব্দে রাজার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাজার মনটাও যেন কেমন একটু একটু করে নরম হয়ে আসে।

একটু আগে যে মেয়েটাকে ওর ঘর থেকে বের হয়ে যাবার কথা বলতে এসেছিল সে কথাটাও যেন ভুলে যায়।

ক্ষণপূর্বের আক্রোশটা যেন হঠাৎ কেমন করে কখন ইতিমধ্যে ঝিমিয়ে গিয়েছে ও নিজেও তা টের পায় না।

এবং বের হয়ে যাবার কথা বলা তো দূরে থাক—সম্পূর্ণ অন্য কথাই বলে।

বলে, কাল রাত্রে নিশ্চয়ই পেটে কিছু পড়ে নি, চা তৈরী, ইচ্ছা করলে চা খেতে পারেন। আর হাতমুখ যদি ধুতে চান তো পাশের ঘরের সঙ্গে লাগানো বাথরুম আছে।

মধুছন্দা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

বাথরুমে যাবেন তো! পাশের ঘরের লাগানো বাথরুম। রাজা আবার বলে।

মধুছন্দা পাশের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল কিন্তু দুপা গিয়ে থেমে ঘুরে ওর দিকে তাকায়, এটা আপনার বাড়ি?

রাজা মৃদু হেসে বলে, সেই রকমই তো জানি।

এখানে আমি কি করে এলাম?

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একপ্রকার আমার স্কন্ধে আরোহণ করেই বলতে পারেন। যান—কথাবার্তা পরে হবে—আগে হাতমুখ ধুয়ে আসুন বাথরুম থেকে। কাপড়-জামার দশা যা করেছেন দেখছি—ওগুলো ছাড়লেই ভাল হত, কিন্তু আমার এখানে তো শাড়িও নেই—ধুতিরও বালাই আমার নেই—গোটা দুই সুট আর পায়জামা-সার্ট আছে। যদি কাজ চালিয়ে নিতে পারেন তো—এক আধটা দিতে পারি।

পায়জামা! হ্যাঁ, চলবে। মাথা হেলিয়ে মধুছন্দা বলে, হ্যাঁ—দিন—

সুটকেস থেকে একটা পায়জামা ও একটা সার্ট বের করে দিল রাজা মধুছন্দাকে।

মধুছন্দা বাথরুমে গিয়ে ঢুকে দরজা দিল।

বাথরুমে শাওয়ার ছিল। শাওয়ারটা খুলে দিয়ে মধুছন্দা তার নীচে মাথা পেতে দাঁড়াল।

বৃষ্টির ধারার মত সর্বাঙ্গে ঠাণ্ডা জল পড়ে। সমস্ত শরীরটা যেন জুড়িয়ে যায়। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে বের হয়ে এল পায়জামা আর সার্ট পরে মধুছন্দা।

ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে রাজা বলে, চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, আবার চায়ের জল চাপিয়েছি,—বসুন।

চা পান করতে করতে দু জনের মধ্যে কথাবার্তা চলে।

রাজা শুধায়, বাড়ি কোথায়?

বাড়ি!

হ্যাঁ।

নেই।

চকিতে মুখ তুলে তাকায় মধুছন্দা, কেন বলুন তো। আমার বাড়ি কোথায় জানার আপনার দরকার কি?

রাস্তার ধারে কে. এল. এম. এর অফিসের গেটের সামনে সিঁড়িতে কাল শুয়েছিলেন কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।

আমার বাড়ি নেই।

তা না হয় নাই থাকল বাড়ি, কিন্তু বাড়ি থেকে পালালেন কেন!

চম্‌কে ওঠে আবার মধুছন্দা, কে বললে পালিয়েছি?

পালান নি তো রাস্তায় পড়ে ঘুমোচ্ছিলেন কেন?

ঘুম পেয়েছিল তাই!

ঘুমোবার জায়গাই বটে। নিম্ন কণ্ঠে বলে রাজা।

ইতিমধ্যে একটা একটা করে প্লেটের সমস্ত বিস্কুট শেষ করে ফেলেছিল মধুছন্দা। শূন্য প্লেটটার দিকে তাকিয়ে রাজা শুধায়, আর বিস্কুট দেব?

না।

চা আর এক কাপ।

না।

নামটা কি?

আমার নাম দিয়ে কি হবে আপনার! রূঢ় কণ্ঠে বলে মধুছন্দা।

নাম দিয়ে আর কি হয়, বিশেষ একজন কাউকে ডাকতে সুবিধা হয়।

হঠাৎ ঐ চময় মধুছন্দা উঠে পড়ে।

ওকি উঠছেন কেন?

আমি যাব।

কোথায় যাবেন?

যেখানে আমার খুশি।

কিন্তু একটু আগেই তো আপনি বলছিলেন বাড়িঘর-দ্বার আপনার কিছু নেই।

মধুছন্দা রাজার ঐ কথার কোন জবাব দেয় না। দরজার দিকে এগিয়ে চলে।

রাজাও বাধা দেয় না। যেমন চেয়ারটার উপরে বসেছিল তেমনি বসে থেকে একটা সিগ্‌রেট ধরায়।

মধুছন্দা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিনিট দুই পরেই কিন্তু মধুছন্দা আবার ফিরে এল।

রাজা তখন আপন মনে সিগ্‌রেট টেনে চলেছে।

মধুছন্দা ডাকে, শুনছেন!

সিগ্‌রেট টানতে টানতেই মধুছন্দার দিকে না তাকিয়ে রাজা বলে, শুনছি। কি বলুন?

আমার সঙ্গে যে টাকা ছিল সে যেন কোথায় পড়ে গিয়েছে, কটা টাকা আমাকে ধার দিতে পারেন।

ধার! তা হুঁ। পারি, কটা চাই।

যা দেবেন! দশ পনের যা হোক।

রাজা উঠে গিয়ে পাশের ঘরে দেওয়ালে টাঙ্গানো জামার পকেট থেকে গোটা দুই দশ টাকার নোট এনে দিল মধুছন্দাকে।

ধন্যবাদ। আচ্ছা চলি—

মধুছন্দা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রাজা আবার চেয়ারটার উপরে চেপে বসে নতুন একটা সিগ্‌রেটে অগ্নিসংযোগ করে।

॥ ৮ ॥

সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে মধুছন্দা একেবারে রাস্তায় এসে পড়ল। বেশ চড়চড়ে রোদ উঠেছে তখন বাইরে। সেই রোদের মধ্যেই হাঁটতে হাঁটতে চলে মধুছন্দা ফুটপাত ধরে। মনটা যেন অদ্ভুত খুশীতে টলমল করতে থাকে মধুছন্দার।

পথের ধারে গাছে গাছে ঠাণ্ডা হাওয়ায় স্পর্শ লেগেছে, টুপটাপ করে পাতাগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে। এলোমেলো হাওয়ায় সেই খসে পড়া পাতাগুলো এদিক ওদিক রাস্তায় উড়ে উড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

একটা প্রাইভেট কার শোঁ করে ফুটপাতের গা ঘেঁসে একেবারে চলে গেল।

তার পরেই একটা যাত্রী ভর্তি বাস।

কোথাও যেন কোন বাঁধন নেই, নিষেধ নেই। চৌকাঠ ডিঙ্গোবার কোন মানা নেই।

কাটারীয়া নেই, গর্জন সিং, ছগন লাল বা দুষ্মন্ত কেউ নেই।

পথের ধারে ঐ মস্তবড় কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডালে ওটা কি পাখী, গায়ের পালকে লাল লাল ছিট,—যেন ধূসর পালকে রক্তচন্দনের ছিট। কিচির মিচির করে ওটা কি বলছে। কিছু বলছে না, খুশী মনে গান গাইছে।

মধুছন্দাও একদিন খুশী মনে অমনি করে গান গাইত।

ভুলে গিয়েছিল এতদিন সে সব গান মধুছন্দা? কি যেন গানের লাইনগুলো।

পথ চলতে চলতেই মনে করবার চেষ্টা করে মধুছন্দা ভুলে যাওয়া সেই গানের লাইনগুলো।

বাবা বলেছিল জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করলেই তাকে একটা পিওনো কিনে দেবে।

বাবা। মনে পড়েছে বাবার সেই মুখটা।

হঠাৎ রক্তচাপাধিক্যে স্ট্রোক হয়ে মৃত্যু হল বাবার। শেষ সময় দেখতেও পায় নি বাবাকে বেচারী।

উঃ আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত তবে কি তার এই দুর্দশা হত।

পাশ দিয়ে দু-চারজন লোক হেঁটে গেল মধুছন্দার। কিন্তু যাবার সময় দু-একজন যেন তার দিকে কেমন করে তাকাতে তাকাতে গেল। মধুছন্দা তবু আপন মনেই হেঁটে চলে।

বড় রাস্তার ধারে একটি ফেরিওয়ালা ফুটপাতেব ওপর এক গাদা পুরোনো টুপি ছড়িয়ে বিক্রী করছে। ছড়ানো টুপিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মধুছন্দা।

বেছে বেছে দেড়টাকা দামের একটা টুপি নিল। দশ টাকার একটা নোট বের করে দিল। যে লোকটা টুপি বিক্রী করছিল দশ টাকার নোট দেখে সে বলে, চেঞ্জ নেই?

না। বলে মধুছন্দা টুপিটা মাথায় পরে। এবং বলে, 'আয়না' আছে?

অদ্ভুত বেশধারী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিল টুপিওয়ালা তখন। মনে মনে ভাবছিল বুঝি এ আবার কোন দিশি ঢং। বয়স্কা বাঙালী মেয়ে শাড়ি না পরে পায়জামা আর সার্ট পরে আছে।

ওদিকে মধুছন্দার সামনেই ফুটপাতের উপরে একটা পান সিগ্‌রেটের দোকানে টাঙানো আয়নাটা নজরে পড়ায় ঐ দিকে এগিয়ে যায়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে টুপিটা ফিট করেছে কি না। মন্দ নয়, বেশ দেখাচ্ছে টুপিটা মাথায় দিয়ে।

টুপিওয়ালাটার কাছে সত্যিই দশ টাকার নোটের ভাঙানি ছিল না। সে এসে ঐ পানের দোকানেই নোটটা ভাঙিয়ে বাকী চেঞ্জ দিয়ে দিল মধুছন্দাকে।

মধুছন্দাও চেঞ্জটা না গুনেই জামার পকেটে সব সমেত হাত ঢুকিয়ে রেখে দিল। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল।

সামনেই ট্রাম লাইন, ট্রাম চলছে।

ঐ ট্রামটা কোথায় যাচ্ছে ঘড়ঘড় শব্দে ঘন্টি বাজিয়ে। চেয়ে দেখল মধুছন্দা ট্রামের মাথায় লেখা আছে, এসপ্লানেড।

এত বয়স হল মধুছন্দার, আজ পর্যন্ত কখনও তার মনে পড়ে না ট্রামে বা রিক্সায় চেপেছে।

মিশনারী হোস্টেলের ওদের দোতলাব জানালাপথে ট্রামলাইন দিয়ে কতদিন দেখেছে কত সব ট্রাম আসছে আর যাচ্ছে ঘড়ঘড় শব্দ তুলে, মধ্যে মধ্যে ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে। বেশ লাগত ওর ঐ ঘড়ঘড় চাকার শব্দ আর ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজটা শুনতে।

বিশেষ করে কোন কোন দিন ঘুম না আসা রাত্রের দিকে যখন শহরের কেলাহল ক্রমশ ঝিমিয়ে আসত—ডিপোমুখো শেষ ট্রামগুলো ঢং ঢং ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে যেত—ও জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত।

প্রায় খালি ট্রামগুলো, ভিতরে আলো জ্বলছে, ঢং ঢং ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলছে ডিপোর দিকে সে রাতের মত।

একটা এসপ্লানেডমুখী ট্রামে উঠে পড়ল মধুছন্দা। অফিসের ভিড় তখন ট্রামে। বসা তো দূরস্থান—দাঁড়াবার পর্যন্ত জায়গা নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকে মধুছন্দা। বেশ দোলায় শরীরটা।

কিছুদূর যাবার রর একটা লেডিস সীট খালি হওয়ায় বসে পড়ল মধুছন্দা।

এসপ্লানেডের মোড়ে এসে ঐ ট্রামটা থেকে নেমে আবার হাওড়াগামী একটা ট্রামে উঠে বসল।

চেয়ারটার উপর বসে সামনের টেবিলটার উপরে পা দুটো তুলে দিয়ে রাজা একটার পর একটা সিগ্‌রেট পোড়াচ্ছিল।

আজ আর কেন যেন বাড়ি থেকে কোথাও বেরুবার মত তাগিদ বোধ করছিল না মনের মধ্যে রাজা।

তাছাড়া গত রাত্রে যখন বেশ কিছু ফ্ল্যাস খেলে রোজগার হয়েছে, আপাততঃ টাকার চিন্তাটাও নেই। যা রোজগার হয়েছে একটা সপ্তাহ অন্তত ওর চলে যাবে রাজা জানে।

চেয়ারটার উপরে গা ঢেলে দিয়ে সিগ্‌রেট টানতে টানতে মেয়েটির কথাই ভাবছিল রাজা।

হাতের হীরার আংটিটাই ওর কিছু পরিচয় দিয়েছে। তার উপরে ঐ ভাবে টাকা চেয়ে নেবার ভঙ্গীটাও ভিতরকার একটা শিশু মনেরই পরিচয় দেয় মেয়েটির।

কিন্তু যাক্‌গে মরুক্‌গে। কি হবে ঐ মেয়েটার কথা ভেবে। জীবনের ঐ দিকটার আজ পর্যন্ত কখনও কোন আকর্ষণ বোধ করে নি রাজা।

রাজার ধারণা জীবনে স্ত্রীলোক মানেই শাসন আর বিধিনিষেধের নানা ঝামেলা, গোলমাল আর অনর্থক জট পাকানো। এবং ঐ মনোবৃত্তি থেকেই রাজার মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিচিত্র একটা বিতৃষ্ণা নারীমাত্রেরই প্রতি!

রাজা তার বাপকে দেখে নি কারণ তার জন্মের দু মাস পূর্বেই তার বাপ মারা গিয়েছিল।

মানুষ হয়েছিল রাজা মার কাছে। বলতে গেলে জীবনে তার এই প্রথম ও শেষ নারী।

এবং পরবর্তীকালে সংসারের যাবতীয় স্ত্রীলোকদের যে এড়িয়ে গিয়েছে এবং সাধ্যমত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে রাজা, সেও ওই মায়ের স্মৃতি তার অবচেতন মনের মধ্যে যে নারীমাত্রের প্রতিই বিচিত্র একটা বিতৃষ্ণাবোধ সৃষ্টি করেছিল সেই বিতৃষ্ণাবোধ থেকেই।

রাজার জননী সুধাময়ী ছিলেন রসকস-মায়ামমতাহীন নিয়মানুবর্তিতা, সংযম ও নিষ্ঠার অপূর্ব এক সংমিশ্রণ। স্বামীর অকালমৃত্যুতে কিছুদিনের জন্য নিজেকে অসহায় বোধ করেছিলেন সুধাময়ী—কিন্তু তার পরই তিনি নিজের চেষ্টায় ম্যাট্রিক ট্রেনিং পাস করে একটা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরী পান।

অত্যন্ত স্বাধীন প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন সুধাময়ী।

চাকরি যতদিন না পেয়েছিলেন, সুধাময়ী—রাজাকে তিনি তার ভাইয়ের বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন, কিন্তু চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কাছেই ছেলেকে নিয়ে আসেন।

নিজের কাছে সর্বদা চোখে চোখে রেখে মানুষ করতে থাকেন।

আর সেই শুরু হল বালক রাজার জীবনে নিয়মানুবর্তিতা, সংযম ও নিষ্ঠার পাঠগ্রহণ। হাজারো বাধানিষেধের অনুশাসন। কেবল উপদেশ আর উপদেশ, চোখ রাঙানি।

বালকমন হাঁপিয়ে ওঠে। থেকে থেকে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়, কিন্তু পারে না, মার মুখের দিকেই চাইলেই ভয়ে যেন কেমন পিছিয়ে আসতে হয়।

তবু তার মধ্যে এতটুকু ফাঁক পেলেই মনের লাগাম ছেড়ে দিত রাজা। অনিয়মের উত্তেজনায় রোমাঞ্চ বোধ করত!

কিন্তু সুধাময়ীর খরদৃষ্টি বেশীক্ষণ তাকে সেই রোমাঞ্চ বোধ করতে দিত না।

একটুখানি মমতা একটুখানি প্রশ্রয়ের জন্য মনটা যখন একটুখানি ফাঁক খুজে বেড়িয়েছে, সুধাময়ী তাকে এনে বইয়ের সামনে বসিয়ে দিয়েছেন, পড়ো, মনোযোগ দিয়ে পড়ো, মনে রেখো তোমাকে মানুষ হতে হবে।

মানুষ হতে হবে, তাকে মানুষ হতে হবে। এই কথাটাই বার বার মা সুধাময়ীর মুখে শুনে এসেছে রাজা।

কিন্তু সুধাময়ী শিক্ষয়িত্রীর জীবন নিলেও জানতেন না, পাখীকে শিকলে বেঁধে বুলি শেখালে সে শেখানো বুলি বলে বটে, কিন্তু ফাঁক

পেলেই সে শিকল কেটে উড়ে যেতে একটুও দেরি করে না। রাজার বেলায় ঠিক তাই হয়েছিল।

ম্যাট্রিকটা পাশ করবার পর ছোট শহরের স্কুল থেকে কলকাতায় এল পড়তে কলেজে রাজা এবং তার চিরদিনের বন্দী মনটা মুক্তির আস্বাদ পেয়ে যেন জীবনে প্রথম ডানা মেলে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

কলেজে নামটা রইল বটে রাজার, কিন্তু বই খাতাপত্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রইল না—খেয়ালখুশি মত এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মার চিঠি আসত সপ্তাহে তিন চারখানা করে উপদেশের নির্দেশ নিয়ে—চিঠিগুলো সে না পড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিত। ফলে একদিন যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল রাজার নামটা কোথাও নেই সাফল্যের লিস্টের মধ্যে।

রাজা জানত অতঃপর কি হবে। এবং হলও তাই।

সুধাময়ী গেজেটটা হাতে করে সোজা এসে একদিন সকালে রাজার হোস্টেলে হাজির হলেন।

বললেন, লিস্টে তোমার নাম নেই দেখেছ বোধ হয়?

দেখেছি!

এমন স্পষ্ট জবাব যে ছেলে কোনদিন তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে দিতে পারে সুধাময়ীর যেন এই প্রথম অভিজ্ঞতা। বোবা হয়ে যান যেন সুধাময়ী। কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারেন না।

অকস্মাৎ যেন বোমার মতই ফেটে পড়লেন। বললেন, আমি জানতে চাই টাকাগুলো নষ্ট করলে কোন লজ্জায়।

রাজা বলে, রোজগার করে এনে দেব।

তাহলে এবার সেই রাস্তা দেখে নাও—কথাটা বলে সুধাময়ী আর দাঁড়ান নি। হাতের গেজেটটা হাতে নিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

রাজাও আর মার কাছে ফিরে যায় নি, সুধাময়ীও আর ছেলের নাম উচ্চারণ করেন নি বাকী জীবনটা।

এমন কি শোনা যায়, মৃত্যুসময় বলে গিয়েছিলেন ও যেন আমার মুখে আগুন না দেয়।

॥ ৯ ॥

হোস্টেল থেকে ঐ দিনই বেরুতে হয়েছিল রাজাকে, কারণ পুত্রের দরুন জননীর যে চ্যারিটি তা যে অতঃপর চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল পুত্র রাজার বুঝতে বাকী ছিল না।

কিন্তু পথে নেমে দেখল রাজা জীবনের চলার পথটা সত্যিই অত সরল নয়।

একদিন মার দেওয়া নিয়মিত মাসোহারায় মুক্তির যে আনন্দটা ওকে বেপরোয়া করে তুলেছিল এবং মনে হয়েছিল বুঝি আনন্দটাই সত্যি—আজ মাসোহারাটা বন্ধ হওয়ায় রাজা বুঝতে পারল তার চাইতে বড় মিথ্যা আর কিছু নেই।

পয়সা না থাকলে মুক্তিটাও মিথ্যা হয়ে যায়। সে মুক্তি পেটে অন্ন দেয় না ক্ষুধার সময় এবং মাথা গুঁজবার আশ্রয়ও দেয় না।

তা না হোক, তবু হার মানবার ছেলে রাজা ছিল না। পথে পথে অনেকদিন তার পর ঘুরেছে রাজা।

কলের জলে তৃষ্ণা মিটিয়েছে, ফুটপাতে বা পার্কের বেঞ্চে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে অনেক পথ অতিক্রম করে পা দুটোতে ব্যথা ধরিয়েছে।

তবু মনে অদ্ভুত এক তার আশা ছিল এই ঘোরার একদিন শেষ হবে, আশ্রয় একটা তার মিলবেই, দু বেলা নিয়মিত খাদ্যও মিলবে।

শেষ পর্যন্ত একদিন আশ্রয় ও খাদ্য মিলেছিল তার, কিন্তু যাযাবর ও ঘোরা বৃত্তিটা তার স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল।

শিশুকাল থেকে অনেকদিন পর্যন্ত সুধাময়ীর প্রচণ্ড তাঁবে থেকে তাঁর নিয়ত শাসন ও মমত্ববোধহীনতা যেমন অচেতন মনের মধ্যে নারীমাত্রের প্রতিই তার একটা বিচিত্র বিতৃষ্ণা জন্মে দিয়েছিল এবং যার ফলে পরবর্তীকালে নারীর ছায়াও সে পরিহার করে এসেছে তেমনি দীর্ঘদিনের পথে পথে ঘোরায় ফলে ঘর একটা পেয়েও ঘরে সে মন বসাতে পারে নি আর।

কাজের ধান্ধায় ও পেটের ধান্ধায় ঘুরতে ঘুরতে বহু বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে—ও তাদের জীবনযাত্রা, কর্মপদ্ধতি কেমন যেন রাজাকে সিনিক করে তুলেছিল।

আজকের দিনে কোন মানুষের মধ্যেই কেবলমাত্র অর্থ আর স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নেই—এইটাই ধারণা করে নিয়েছিল রাজা।

তাই আপনার বলতেও যেমন কেউ ছিল না, রাজার তেমনি বন্ধু বলতেও কেউ ছিল না। এবং ঐ বিচিত্র মানসিক বিকৃতিতেই রাজা জানতে পারে নি এবং বুঝতেও পারে নি যে প্রীতি ও মমত্ববোধের উপর মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস গড়ে ওঠে সে প্রীতি বা মমত্ব-বোধের সঙ্গে শৈশবাবধি তার পরিচয় ঘটে নি বলেই মনটা তার সিনিক হয়ে উঠেছিল।

ভালবেসেই তো দুঃখবোধ।

ভালই যে জীবনে বাসল না সে দুঃখ কেমন তা জানবে কেমন করে!

তাই বোধকরি মধুছন্দার আসা ও চলে যাওয়াটা তার মনের মধ্যে কোন দোলাই জাগায়নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনের কোণে কোথায় একটা যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছিল।

এবং মধুছন্দা চলে যাবার পরও তাই রাজা চেয়ারটার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করে চলছিল।

কিন্তু আশ্চর্য। কিছুক্ষণ পর যেন ঘরের মধ্যে অমনি চুপচাপ নিষ্ক্রিয় বসে থাকাও ভাল লাগে না।

এবং শেষ পর্যন্ত একসময় উঠে পড়ে রাজা। জামাকাপড় পরে দরজার গা-তালায় চাবিটা দিয়ে বের হয়ে পড়ে।

পথে বের হয়ে হাঁটতেও ভাল লাগে না আজ রাজার। একটা ট্যাক্সী হাত ইশারায় ডেকে উঠে বসে। কোথায় যাওয়া যায় মনে হতেই মনে পড়ল 'বার্তাবহ' অফিসে অনেকদিন যায় নি। সেখানে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দিয়ে আসলে কেমন হয়।

সোজা বার্তাবহ অফিসে গিয়েই হাজির হল রাজা।

বার্তাবহ সংবাদপত্রটি বাজারে বেশ চালু এবং ভালই কাটে। কাটবার অবশ্য একটি বিশেষ কারণ ছিল।

নানা ধরণের মুখরোচক সংবাদ, প্রত্যহ দুটি পৃষ্ঠা জুড়ে বার্তাবহে বেশ ফলাও করে রং চং দিয়ে প্রকাশিত হত।

বিচিত্র সব চোরাই কারবার থেকে শুরু করে, শহরের সব হোটেল রেঁস্তোরার রাতের আসরের যত সব নাম করা সোসাইটির বড় বড় ঘরের কেলেঙ্কারী, প্রেমঘটিত ব্যাপারের বিচিত্র সব রোমঞ্চকর সংবাদ, তাদের গৃহ-কেলেঙ্কারী,—বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নানা ধরণের গোপন সংবাদ। কার সঙ্গে কে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল—কে কার সঙ্গে কেথোয় রাত্রি বাস করল, স্বামী স্ত্রী হয়তো কারা পৃথক থাকে নানা ধরণের সংবাদ-বিচিত্রা পরিবেশন করার জন্য কাগজটার যেমন চাহিদা ছিল তেমনি বার্তাবহের সম্পাদক শুভঙ্কর মিত্রের একটা বিশেষ পরিচয়ও ছিল সমাজের উঁচু স্তর থেকে নাচু অন্ধকার স্তর পর্যন্ত।

অবিশ্যি শুভঙ্কর মিত্রকে সে পরিচয়টুকু অর্জনের জন্য দামও দিতে হয়েছে প্রচুর।

কতবার যে মাথা ফেটেছে, হাত পা ভেঙ্গেছে, প্রাণসংশয় হয়ে হাসপাতালে দু-তিন মাস পড়ে থাকতে হয়েছে সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তারও ইয়ত্তা নেই। তবু যেন মানুষটা বেপরোয়া।

বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে রাজা একদিন ঐ শুভঙ্কর মিত্রের

কাছেই প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিল। এবং আজকের রাজা যে শুভঙ্কর মিত্রের হাতে তৈরী সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

শুভঙ্কর মিত্র রাজাকে বরাবর বলেছে একটা কথা, দেখো রাজা সাহেব, জীবনের আজকের মূল কথাটাই হচ্ছে বাঁচা to live! তা সে যেমন করে যে ভাবেই হোক। এবং বাঁচতে হলে জেনো আশেপাশের মানুষগুলি, তা সে যে স্তরেরই হোক না কেন, কাউকে ঘৃণা করো না অবহেলা করো না, Keep a mask of friendship on your face and go ahead! আর টাকা, টাকা জেনো যে earn করতে পারবে তারই। তোমাকে ঐ carningয়ের রাস্তাটা খুঁজে বের করতে হবে, and try to live happily; eat, drink and be merry!

এক সময় প্রথম দিকে রাজার ভালই লাগত শুভঙ্কর মিত্র ল্যোকটাকে, কিন্তু এখন যেন কেমন গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

বেঁটে অস্থিচর্মসার লোকটা দেখতে। অবিশ্যি গায়ের রংটা কিন্তু অদ্ভুত রকম টকটকে ফর্সা—এবং সেই গৌর বর্ণের মধ্যে একটা হলদেটে আভা।

মুখটা চৌকো মঙ্গোলিয়ান প্যাটার্ণের। ছোট ছোট চোখ। ভোঁতা নাক। ছোট ছোট সুগঠিত দুসারি দাঁত—তার মধ্যে গোটা দুই সামনের দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

পরিধানে সর্বদা দামী সুট। সুটের প্রত্যেকটি ক্রীজ একেবারে সুস্পষ্ট। মাথার চুল একেবারে কদম ছাঁট করা। থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। মুখে সর্বদা একটা পাইপ। কথা বলে কম এবং চিবিয়ে চিবিয়ে।

লোকটাকে রাজা কখনো হাসতে দেখে নি।

হাসির কথা বললে শুভঙ্কর বলত, আমি সশব্দে হাসি না, নিঃশব্দে silently, তাই হাসতে তোমরা আমাকে দেখ না।

শুধু হাসতেই যে লোকে কখনো দেখে নি তাকে তাই নয়, তীব্রতম যন্ত্রণাতেও কেউ কখনো তাকে সামান্য মুখবিকৃতি করতে দেখে নি আজ পর্যন্ত।

শুভঙ্কর মিত্র বার্তাবহ কাগজটার সম্পাদকই নয় কেবল, একমাত্র মালিকও।

কাগজের সব কিছুই সে।

শুভঙ্কর মিত্র লোকটার এমন বিচিত্র স্বভাব ও প্রকৃতি হলে কি হবে, রীতিমত শিক্ষিত। ইংরাজী ও অর্থনীতিতে এম. এ.। তাছাড়া বিদেশ থেকে জার্নালিজমের ট্রেনিংও নিয়ে এসেছে।

লোকটার আদি ইতিহাস আজ পর্যন্ত কেউ জানে না, কারণ সেটা যেমন ধোঁয়াটে তেমনি ঝাপসা। তবে সে যে সোনার চামচ ছেড়ে একটা তামার চামচও মুখে নিয়ে একদিন জন্মায় নি কথাটা ঠিক।

কিন্তু চামচ নিয়ে না জ.. ? আজ সে শুভঙ্কর মিত্র।

সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ একটা পরিচয়, একটা ভীতি, একটা আতঙ্ক! শুভঙ্কর মিত্রকে ভয় করে না যেমন সারা শহরে এমন কেউ আছে কিনা সন্দেহ, তেমনি তাকে ঘৃণা করে না এমন কেউ আছে কিনাও সন্দেহ।

বার্তাবহ অফিসে যখন এসে রাজা পৌঁছল, নীচের মেসিনঘরে বিরাট রোটারী মেসিন ঘড়ঘড় শব্দে চলছে। পরের দিনের সংবাদপত্র ছাপা হচ্ছে। কার কোন কেলেঙ্কারী যে আগামীকাল বার্তাবহের পাতায় প্রকাশ হবে কে জানে।

সামনের উঠোনেই নজরে পড়ল রাজার শুভঙ্কর মিত্রের সাদা রংয়ের ঝক্‌ঝকে লাকসারি এয়ারকনডিসন্‌ড ফ্যালকন ফোর্ড গাড়িটা।

ঐ গাড়িটাই রাজাকে জানিয়ে দেয়, শুভঙ্কর মিত্র অফিসেই আছে।

ডান হাতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল রাজা।

ডাইনে এবং বাঁয়ে প্যাসেজ এবং প্যাসেজের গায়ে গায়ে সব ছোট ছোট কামরা।

এক এক কামরায় এক একটা বিভাগীয় অফিস। কর্মব্যস্ততার সাড়া ঘরে ঘরে। অসংখ্য কণ্ঠের গুন গুন গুঞ্জন শোনা যায়।

শুভঙ্করের অফিসটা তিনতলায়।

সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে বারান্দার শেষ প্রান্তে দক্ষিণমুখী ঘরটা এয়ারকনডিসন করা।

বেয়ারা দীনু ঘরের দরজায় একটা টুলের উপর বসে ঝিমুচ্ছিল।

রাজার পদশব্দে চোখ মেলে তাকিয়ে একগাল হাসল, রাজা সাহেব।

বার্তাবহ অফিসে শুভঙ্করের দেওয়া নামেই রাজা পরিচিত।

মিত্তির সাহেব ঘরে আছে নাকি রে? রাজা শুধায়।

হ্যাঁ—যান না—

দীনু জানত সাহেবের ঘরে সর্বদাই রাজা সাহেবের অবারিত দ্বার।

কেউ আছে ঘরে?

আছে—একজন।

কে?

তা তো জানি না।

রাজা আর কথা বাড়ায় না। কাচের ভারা দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে!

ঘরের মধ্যে ঢুকেই কিন্তু রাজা থমকে দাঁড়ায়।

অস্থিরভাবে মুখে পাইপ লাগিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে শুভঙ্কর মিত্র, আর তার সামনেই ৩৭।৩৮ বৎসরের একটি দামী স্যুট পরিহিত লোক দুহাতের দশ আঙ্গুল পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে বসে আছে।

রাজা থমকে দাঁড়িয়েছিল শুভঙ্কর মিত্রকে ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে দেখে। কারণ বারবার দেখে এসেছে রাজা যখনই কোন একটা ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তা করে শুভঙ্কর মিত্র, ব্যাপারটার একটা মনোমত মীমাংসা খুজে না পাওয়া পর্যন্ত সে ঐভাবে ঘরের মধ্যে ক্রমাগত পায়চারি করতে থাকে।

দরজা খুলে রাজা ঘরে ঢুকতেই ভ্রূ কুঞ্চিত করে দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল শুভঙ্কর মিত্র কিন্তু ঘরের মধ্যে রাজাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে

তার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল সরল হয়ে আসে, এই যে রাজা। I was just' thinking! ভাবছিলাম কার কাছে আমি সাহায্য পেতে পারি—yes—you are the right person! রাজা—

কি ব্যাপার? রাজা এগিয়ে আসে আরো দু-পা!

এসো, তোমার সঙ্গে মল্লিকার সাহেবের আলাপ করিয়ে দিই—মস্ত বড় বিজনেস ম্যাগনেট—মিঃ দুষ্মন্ত মল্লিক—এর নাম রাজা ব্যানার্জ্জী—এর পরিচয় পাবেন এর কাজে।

দুষ্মন্ত মল্লিক সঙ্গে সঙ্গে সাহেবী কেতায় হ্যাণ্ডসেক করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে রাজার দিকে মৃদু হাস্যে বলে, Glad to meet yon Mr.—

কিন্তু দুষ্মন্ত মল্লিক কথাটা শেষ করতে পারল না।

রাজা তার প্রসারিত হাতের মধ্যে হাত না বাড়িয়ে দিয়ে দু হাত তুলে নমস্কার জানাল, নমস্কার।

এবারে ভাল করে তাকাল রাজা লোকটার মুখের দিকে।

পাঁচ ফুটের বেশী লম্বা হবে না লোকটা দৈর্ঘে। এবং রীতিমত গোলগাল যাকে বলে নন্দদুলাল প্যাটার্ণের চেহারা দুষ্মন্ত মল্লিকের। মুখটাও গোল। ওষ্ঠের উপরে ভারি একজোড়া গোঁফ। মাঝখানে সিঁথি। কিন্তু চোখ দুটোতে যেন সন্দেহ আর শয়তানি উঁকি দিচ্ছে। গায়ের রং আবলুস কাঠের মত কালো। এবং কালোর উপরে একটা চিকনাই আছে। পরিধানে দামী ছাই রংয়ের ট্রপিক্যাল সুট্।

শুভঙ্কর মিত্রই বলে, বোসো রাজা—বোসো।

রাজা কিন্তু বসে না। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগরেটের প্যাকেটটা বের করে। প্যাকেট থেকে একটা সিগরেট নিয়ে ওষ্ঠে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করে।

শুভঙ্কর মিত্রই আবার কথা বললে। রাজা, মিঃ মল্লিক একটা বিপদে পড়ে আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। ওকে যদি তুমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার তো উনি—

শুভঙ্কর মিত্রের মুখের কথাটা একরকম কেড়ে নিয়েই দুষ্মন্ত

মল্লিক বলে, আমি আপনাদের দশ হাজার টাকা দিতে রাজী আছি মিঃ ব্যানার্জী।

টাকার অঙ্কটা শুনেই রাজা দুষ্মন্ত মল্লিকের মুখের দিকে তাকাল।

আপনার বিপদের কথাটা ওকে খুলে বলুন না মিঃ মল্লিক! শুভঙ্কর মিত্রই আবার বলে, দেখুন—ও ঠিক খুঁজে বের করে দেবে।

রাজার ভ্রূ দুটো আবার কুঞ্চিত হয়ে ওঠে শুভঙ্কর মিত্রের শেষের কথায়। আবারও একবার দুষ্মন্ত মল্লিকের মুখের দিকে ও একবার শুভঙ্কর মিত্রের মুখের দিকে তাকায়। তার পর মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে, খুঁজে বের করতে হবে কি?

একটি মেয়েকে! বললে শুভঙ্কর মিত্র।

মেয়ে!

হুঁ, বছর উনিস-কুড়ির একটি মেয়ে।

নিরুদ্দেশ হয়েছে বুঝি? রাজা আবার প্রশ্ন করে!

শুভঙ্করই বলে, হ্যাঁ!

কবে!

দিন তিনেক হল। বলে এবারে দুষ্মন্ত মল্লিক মধুছন্দার নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা সংক্ষেপে খুলে বলে গেল।

তা পুলিসের শরণাপন্ন না হয়ে এখানে এসেছেন কেন উনি? প্রশ্নটা রাজা শুভঙ্কর মিত্রকেই করে।

না, পুলিসের দ্বারস্থ উনি হতে চান না।

কেন?

এবারে আবার দুষ্মন্ত মল্লিকই কথা বলে, কি জানেন মিঃ ব্যানার্জী, একে ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘরোয়া—এবং মস্তবড় একটা নামকরা ফ্যামিলির প্রেসটিজ্ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে—বুঝতেই তো পারছেন—শত্রুর তো অভাব নেই, কোনক্রমে তারা এ সংবাদ জানতে পারলে একটাকে দশটা করে রং চং লাগিয়ে কাদা ছিটোতে বাকী রাখবে না।

তা বয়স্কা মেয়ে বাড়ি থেকে এভাবে পালালে কাদা তো একটু ছিটোবেই, রাজা বলে।

তাতো নিশ্চয়ই কিন্তু আরও একটা কথা আছে মিঃ ব্যানার্জী !

কি ?

মেয়েটির মানে ঐ মধুছন্দা গত দু-বছর ধরে মস্তিষ্কবিকৃতিতে ভুগছিল।

তার মানে মাথা খারাপ ?

হ্যাঁ—

বদ্ধ পাগল নাকি !

না, না—সেরকম কিছু নয়। মনের মধ্যে তার সর্বক্ষণ একটা fixed illusion আছে যে—তাকে ঘরের মধ্যে জোর করে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাই তো তাকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছিল বিশেষজ্ঞদের দিয়ে।

হঠাৎ এবারে রাজা সিগরেটে টান দিয়ে প্রশ্ন করে, মেয়েটি মানে ঐ মধুছন্দার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক !

রাজার আচমকা প্রশ্নে যেন দুষ্মন্ত মল্লিক হঠাৎ কেমন একটু থমকে যায়। এবং প্রশ্নের কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু চুপ করে থাকাও যায় না। রাজা তখন চেয়ে আছে তারই মুখের দিকে। তাই আমতা আমতা করে বলে। মানে—বলতে পারেন সে আমার দূর সম্পর্কীয় বোন।

রাজা পালটা প্রশ্ন করে, দূর সম্পর্কীয় বোন ?

হ্যাঁ—

হুঁ।

মুহূর্তকাল অতঃপর আবার রাজা দুষ্মন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটির বাপ মা তো নেই বললেন। তা মেয়েটির আর কোন ভাইবোন নেই !

না। একাই ও।

তার মানে বলুন চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীর একমাত্র মালিক ঐ মেয়েটি ?

তাই।

পুলিসের সাহায্য তাহলে আপনি নেবেন না ?

না। বুঝতেই তো পারছেন!

তা পারছি।

এখন বলুন, আপনার সাহায্য পাব কি না?

এত তাড়াতাড়ি বলতে পারব না, ভেবে দেখি। মেয়েটির কোনো ফটো এনেছেন?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—এনেছি বৈকি! বলতে বলতে দুষ্মন্ত মল্লিক জামার বুক পকেট থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দেয়, এর মধ্যেই ফটো আছে তার।

হাত বাড়িয়ে রাজা খামটা নিয়ে জামার পকেটে রেখে দিল এবং রাখতে রাখতে বলে আমার কথা যদি শোনেন মিঃ মল্লিক তো এসবের মধ্যে পা বাড়াবেন না।

মানে! একটু যেন অবাক হয়েই দুষ্মন্ত মল্লিক রাজার মুখের দিকে তাকায়।

মানে—ও আপদ গেছে ভালই হয়েছে।

আপদ!

হ্যাঁ—ঐ মেয়ে জাতটাই বিলকুল আপদ! পুরুষ মানুষের যদি পৃথিবীতে সত্যিকারের কোন শত্রু থাকে তো জানবেন—ঐ মেয়েগুলো। যত সর্বনাশের মূলে হচ্ছে ওরা।

ঐ সময় শুভঙ্কর মিত্র মৃদু হেসে বলে, হ্যাঁ মিঃ মল্লিক, আমাদের রাজা সাহেবের থিয়োরী হচ্ছে মানবের শত্রু নারী।

দুষ্মন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠে, না, না—মধুছন্দা সে রকম নয়।

ও সব-ছন্দাই এক! যাক্‌গে আপনার জিনিস আপনি বুঝবেন—তাহলে মিত্র সাহেব—ওর কাছ থেকে যা আগাম নেওয়ার নিয়ে নিন—আমি তাহলে চলি—

কথাটা শেষ করল রাজা শুভঙ্কর মিত্রের দিকে তাকিয়ে এবং দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

শোনো, শোনো রাজা, তোমার টাকার দরকার নেই? শুভঙ্কর ডাকে।

দিতে চান দিতে পারেন।

ঘুরে দাঁড়াল রাজা তার পর মৃদু হেসে বললে, টাকার দরকার নেই এ কথা দুনিয়ার কেউ বলতে পারে নাকি মিত্তির সাহেব।

সামনের ড্রয়ার থেকে একশ টাকার খান দুই নোট বের করে রাজার দিকে এগিয়ে দেয় শুভঙ্কর মিত্র।

নোট দুটো হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পকেটে চালান করে দিতে দিতে রাজা বলে, Thanks!

রাজা আবার দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

এবারে দুষ্মন্ত প্রশ্ন করে, কাল নাগাদ তাহলে খোঁজ নেব মিঃ ব্যানার্জী!

কাল না, দিন সাতেক বাদে নেবেন, রাজা বলে।

সাত দিন?

অবিশ্যি দিন পনেরো বাদে হলেই ভাল হয় তবে সাত দিন বাদে একবার খোঁজ নিয়ে যাবেন এখানে এসে।

কথাটা বলে রাজা উত্তরের অপেক্ষায় আর দাঁড়ায় না, ঘর থেকে সোজা বের হয়ে গেল।

রাজা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর দুষ্মন্ত শুভঙ্কর মিত্রের দিকে তাকাল। এবং স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে, লোকটা বিশ্বাসযোগ্য তো মিত্তির সাহেব।

কার কথা বলছেন?

ঐ যে রাজা না কে—

আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। রাজা যদি মেয়েটাকে খুঁজে না বের করতে পারে তো জানবেন আমার দ্বারা কাজটা হল না।

কিন্তু মিত্তির সাহেব—

দিন সাতেক বাদে আসবেন—

শুভঙ্কর মিত্রের কণ্ঠস্বরটা স্পষ্টই যেন অতঃপর জানিয়ে দিল দুষ্মন্তকে যে এবারে আপনি আসুন—

এবং সেটা বুঝতে পেরেই দুষ্মন্ত মল্লিক উঠে দাঁড়ায় বোধ করি ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্যই।

তাহলে সাত দিন বাদেই খবর নেব।

হ্যাঁ—

কথাটা বলে শুভঙ্কর আর তাকাল না দুষ্মন্তর দিকে, চেয়ারে বসে টেবিলের উপর থেকে একটা ফাইল টেনে নিল।

দুষ্মন্ত ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে যায়।

বার্তাবহ অফিসের বাইরে এসে একটা ট্যাকসী ধরে তাতে উঠে বসল দুষ্মন্ত।

মধুছন্দা তাকে আচ্ছা জব্দ করেছে।

কিন্তু এটাও ভেবে পায় না দুষ্মন্ত, মধুছন্দার এত বড় দুঃসাহস হল কি করে?

কোন দিন যে একা একা বাড়ির বাইরে পা দেয় নি তার এতখানি সাহস হল কোথা থেকে। আর গেলই বা কোথায়? যেতে পারেই বা কোথায়? বোকামী করেছে দুষ্মন্ত। এতদিন চুপ চাপ বসে থেকে বোকামী করেছে। ক্রমশ ঐ ভাবে বন্দিনী থাকতে থাকতে মেয়েটা নরম হয়ে আসবে ভাবাই তার বোকামী হয়েছিল।

কিন্তু এখন আর আফসোস করেই বা কি হবে। হাতের তীর ছুটে গিয়েছে।

বেলা দুপুর পর্যন্ত বলতে গেলে কলকাতা শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক ট্রাম থেকে অন্য ট্রামে চেপে ঘুরে ঘুরে বেড়ালো মধুছন্দা। তার পর এসপ্লানেডের এক রেঁস্তোরায় ঢুকে পেট ভরে খেল।

হোটেল থেকে বের হয়ে ইডেন উদ্যানের দিকে চলতে শুরু করে অন্যমনস্কভাবে।

ফুটপাতের উপরে একটা লোক চিনাবাদাম ও মটর ভাজা বিক্রী করছিল, চার পয়সা দিয়ে তার কাছ থেকে এক ঠোঙ্গা চিনাবাদাম কিনল।

চিনাবাদামের খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ভাজা বাদাম চিবুতে চিবুতে হাঁটতে হাঁটতে চলে মধুছন্দা।

অসংখ্য লোক পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। কেউ কারো দিকে তাকায় না।

বাস, ট্যাকসী ও প্রাইভেট গাড়িগুলো শোঁ করে পাশ দিয়ে চলে যায় যেন।

মাথার উপর সূর্য অনেকটা পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে।

রৌদ্রের তাপ এখন আর ততটা প্রখর মনে হয় না। দু দিকে খোলা অবারিত মাঠ। মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে চওড়া রেড রোডটা। দূরে কেল্লার নিশান দেখা যায়। আর ওদিকে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ। চৌরঙ্গীর বড় বড় বাড়িগুলো সার বেঁধে যেন সীমানা এঁকে দিয়েছে।

কোথাও কোন বাধা নেই। অবারিত মুক্ত চারিদিক। বাতাসে যেন শুধু মুক্তির পরশ।

দু বছরের একটানা বন্দী জীবন। নির্দিষ্ট চারটে দেওয়ালের বাধা আর নেই জীবনে। চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে এসেছে মধুছন্দা।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় মাঠের মধ্যে এক জায়গায় এসে শুয়ে পড়ে মধুছন্দা।

মাথার উপরে নীল আকাশটা পড়ন্ত বেলার সূর্যালোকে স্পষ্ট। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর কখনো কখনো একটা একটা করে খোসা ছাড়িয়ে চিনাবাদাম দাঁত দিয়ে মুচ মুচ করে চিবোয়।

ক্রমে সূর্যের আলো একটু একটু করে ম্লান হয়ে যায়। ঝির ঝির ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

পৃথিবীটা এত বড় কে জানত। এত অবারিত, এত সুন্দর কে জানত।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে যখন চারিদিক ঝাপসা হয়ে এসেছে মাঠ থেকে উঠে আবার হাঁটতে শুরু করে মধুছন্দা। চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে তখন। সাদা, লাল, নীল হরেক রকমের আলো।

ইডেন উদ্যানে যেন কিসের উৎসব। আলোয় আলোয় যেন ঝলমল করছে।

এগিয়ে যায় সেদিকে মধুছন্দা। গেটের মাথায় চোখে পড়ে নিওন সাইনে বড় করে ইংরাজীতে লেখা—ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল একজিবিশন্‌।

গেটে চার আনা দিয়ে টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল মধুছন্দা একজিবিশনে।

উঃ কত লোক, গিস গিস করছে যেন।

স্টলে স্টলে ঘুরতে লাগল মধুছন্দা।

মেরি গো রাউণ্ডে চাপল।

আলোর ফোয়ারা দেখল।

ঠেলা গাড়িতে করে একটা ভেণ্ডার হ্যাপি বয় আইসক্রিম বিক্রী করছিল, আট আনা দিয়ে দুটো চকোলেট বার কিনে তার মধ্যে একটা হাতে নিয়ে ও অন্যটা চুষতে চুষতে আলোর ফোয়ারার সামনে এসে বসল মধুছন্দা।

ফোয়ারার জলে লাল, নীল, সবুজ আলো চারিদিক থেকে ফেলা হয়েছে, বিচ্ছুরিত জলকণায় আলোর রামধনু।

চকলেট বারটা চুষতে চুষতে তন্ময় হয়ে সেই আলোর রামধনুর দিকে তাকিয়ে ছিল মধুছন্দা, হঠাৎ পাশে নজর পড়তেই মধুছন্দা দেখে, অল্প দূরে ফোয়ারার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনে সিগরেট ফুঁকছে রাজা।

মধুছন্দা এগিয়ে যায় রাজার পাশে।

আপনি ?

কে ! ফিরে তাকায় রাজা !

আপনিও বুঝি একজিবিশনে এসেছেন ?

হুঁ !—

রাজা অন্যমনস্ক ভাবে তাকায় মধুছন্দার মুখের দিকে, অদ্ভুত শিশুর মত একটা সারল্য যেন মেয়েটার সমস্ত মুখে। কোন গ্লানি কোন ভয় বা কোন দুশ্চিন্তাই যেন কোথাও নেই, একান্ত নির্বিকার, নিশ্চিন্ত।

হঠাৎ মধুছন্দা প্রশ্ন করে, খাবেন ?

কি ?

চকলেট আইসক্রিম !

হাতের বারটা এগিয়ে ধরে মধুছন্দা রাজার দিকে, নিন্—

না।

খাবেন না !

না।

আইসক্রিম বুঝি ভালবাসেন না।

না।

কেন বলুন তো ?

কি ?

আইসক্রিম ভালবাসেন না কেন ?

রাজা মৃদু হাসে।

লজেন্স্ খাবেন, আছে—

না—

চীনাবাদাম ?

না—

কিছু খান না বুঝি ?

এবারেও কোন জবাব দেয় না রাজা।

॥ ১০ ॥

চকলেট বারটা চুষতে চুষতে মধুছন্দা বলে, nice না !

কি ?

ঐ আলোর ফোয়ারা ?

হ্যাঁ।

অল্প দূরেই বিরাট একটা প্যাণ্ডেল বেঁধে থিয়েটার হচ্ছিল সেই

দিকে আঙুল দেখিয়ে ছকলেট বারটা চুষতে চুষতে মধুছন্দা বলে, ঐ প্যাণ্ডেলে কি হচ্ছে ?

থিয়েটার।

থিয়েটার, মানে অভিনয় !

হ্যাঁ।

থিয়েটার দেখতে বেশ লাগে। স্কুলে আমরা ছাত্রীরা মিলে থিয়েটার করতাম প্রতি বৎসর ফাউনডেশন ডে-তে। চলুন না—যাবেন ?

কি যেন মনে হয় রাজার। বলে, চলুন।

দশ টাকার টিকিট ছাড়া আর সব বিক্রী হয়ে গিয়েছিল—দুটো দশ টাকার টিকিট কিনে দু জনে ভিতরে ঢুকে প্রথম সারিতে গিয়ে দুটো চেয়ারে বসল।

প্লে হচ্ছিল মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

কণ্ব মুনির তপোবনে মহারাজ দুষ্মন্ত এসেছেন, দূর থেকে তাকে কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলা দেখে মুগ্ধ—বাক্যহারা।

প্রিয় সখী অনুসূয়া এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, তবু সম্বিৎ নেই।

সখী শকুন্তলে !

হাঠাৎ ঐ সময় পাশ থেকে কাঁপা কণ্ঠে মধুছন্দা বলে, চানাচুর খাবেন ?

কি !

চানাচুর। খাবেন ?

রাজা বলে, না।

আবার একটু পরে মধুছন্দা কথা বলে, আপনার শীত শীত করছে না ?

না।

আমার কিন্তু শীত করছে।

বিরক্তি বোধ করে রাজা। বলে, থিয়েটার দেখবেন তো দেখুন, না হলে উঠে যান।

আপনিও চলুন না।

না।

আমি তাহলে যাই।

যান।

রাজা টের পেল পাশ থেকে মধুছন্দা উঠে চলে গেল।

থিয়েটার ভাঙ্গল প্রায় রাত দশটা নাগাদ।

একজিবিশন থেকে বের হয়ে রাজা ট্যাকসী ভাড়া করে সোজা গিয়ে একটা হোটেলে উঠল।

দু পেগ গলায় ঢেলে একটা কাগজের বাক্সে কিছু স্ন্যাক্ নিয়ে আবার হোটেল থেকে বের হয়ে এল রাজা।

কিছুদূর হাঁটতেই একটা খালি ট্যাকসী পেয়ে উঠে বসে রাজা।

গীর্জার পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পায় গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত এগারোটা ঘোষণা করছে।

একমাত্র পান সিগরেটের দোকানগুলো ছাড়া অন্যান্য সব দোকানই বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তার দুধারে, রাস্তাতেও ভিড় কম।

চোখ বুজে ট্যাকসীর পিছনের সীটটার ব্যাকে হেলান দিয়ে গাটা এলিয়ে দিয়েছিল রাজা। বোজা চোখের পাতায় বিরাট একটা কালো মুখ একজোড়া গোঁফ যেন ভেসে উঠে।

ভেবে পায় না রাজা মুখটা কার। মুখটা দেখেছে রাজা অথচ মনে করতে পারছে না মুখটা সে কোথায় দেখেছে এবং মুখটা কার।

সামান্য দুটো পেগেই নেশা ধরল নাকি রাজার।

আশ্চর্য। দু পেগেই নেশা!

ঠিক ঐ রকমই একটা মুখ—মনে পড়েছে গ্রামে তাদের একজনের ছিল। স্কুলে যাতায়াতের পথে ছোট একটা কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে একতারা নিয়ে আপন মনে গান গাইতে শুনেছে কতদিন লোকটাকে। মনে পড়েছে হ্যাঁ, তারও মুখটা ছিল ঐ রকম।

লোচনদাস বৈরাগী।

সমস্ত গ্রামের লোক লোচনদাসকে ভালবাসত, ভক্তি করত।

অপূর্ব ছিল লোকটার সুরেলা কণ্ঠ। তার কণ্ঠের দেহতত্ত্বের গান শুনে গ্রামের মধ্যে এমন মানুষ ছিল না যার চোখ দিয়ে জল পড়ত না। কিন্তু কি জানি কেন, রাজার লোকটাকে কোন দিন ভাল লাগে নি।

গোল বাঘের মত কালো মুখটা যেন মনে হয়েছে বরাবর তার।

হঠাৎ একদিন সকালে গ্রামের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। গ্রামের একটি বিধবা বৌকে নাকি লোচনদাস নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। তার পর যতদিন গ্রামে ছিল রাজা, লোচনদাসকে আর দেখতে পায় নি।

তার কুঁড়ে ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করবার সময় কেবল ঐ গোল কুৎসিত মুখটাকে মনে পড়েছে। কিন্তু লোচনদাসকে আর দেখতে না পেলেও মাস আষ্টেক বাদে ঐ ঘটনার একটা সংবাদ সে পেয়েছিল।

লোচনদাস নাকি বিরাট একটা ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ে আসামী হয়েছে। অনেক দিন ধরে নাকি সে ডাকাতি করছিল।

হঠাৎ ট্যাকসী ড্রাইভারের প্রশ্নে চোখ মেলে তাকায় রাজা।

আভি কিধার জায়গা সাব ?

রাজা চেয়ে দেখে গোল পার্কের কাছে সে এসে গিয়েছে।

এবার কোন দিকে যেতে হবে বলে দিল রাজা।

অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিনতলায় নিজের ঘরের দরজার সামনে এসে যেন থমকে দাঁড়ায় রাজা।

বন্ধ দরজার গায়ে হেলান দিয়ে মাটিতে বসে বসেই ঘুমোচ্ছে সেই মেয়েটি।

মনটা হঠাৎ রাজার যেন বিরক্তিতে ভরে যায়।

মেয়েটা আবার তারই ঘরের দরজায় এসে বসে আছে।

হাত বাড়িয়ে মেয়েটার মাথায় ঠেলা দিয়ে বলে রাজা, এই উঠুন—উঠুন—

য়্যাঁ—কে ?

মধুছন্দা চোখ মেলে তাকাল।

ও, আপনি—উঠে দাঁড়ায় মধুছন্দা।

এখানে কি মতলবে এসেছেন আবার ? একটু যেন রূঢ় কণ্ঠেই প্রশ্নটা করে রাজা।

কোথায় যাব ?

অসহায়ের মত প্রশ্ন করে মধুছন্দা।

পূর্ববৎ বিরক্ত কণ্ঠেই রাজা বলে, কোথায় যাবেন তা আমি কি জানি। বলতে বলতে পকেট থেকে চাবিটা বের করে দরজার তালাটা খুলে রাজা ভিতরে প্রবেশ করে।

মধুছন্দাও সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকে।

ঘুরে দাঁড়াল রাজা, ওকি—কোথায় আসছেন ?

মিনতিকরুণ কণ্ঠে বলে মধুছন্দা, শুধু রাতটা।

শুধু রাতটা মানে ?

শুধু রাতটা যদি মেঝেতে একটু শুয়ে থাকতে দেন ! সকালে উঠেই চলে যাব। বড্ড ঘুম পেয়েছে—

ঘুম পেয়েছে তো হয়েছে কি ? এখানে জায়গা হবে না। যান রাস্তায় গিয়ে শুয়ে থাকুন—যত সব ঝামেলা।

কথাগুলো বলতে বলতে রাজা জামাকাপড় ছাড়বার জন্যেই বোধ করি পাশের ঘরে চলে যায়। এবং মিনিট পনেরো বাদে এ ঘরে ফিরে এসে দেখে দরজাটা হা হা করছে খোলা, মেয়েটি মেঝেতে শুয়ে হাতের উপর মাথা রেখে দিব্বি ঘুমোচ্ছে।

হাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়ে মেয়েটাকে উঠিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল রাজা, কিন্তু সামনা সামনি গিয়ে হঠাৎ থম্‌কে যেন দাঁড়িয়ে যায়।

মুখের উপরে আলো এসে পড়েছে ঘুমন্ত মেয়েটার।

সারাদিনের রৌদ্রতাপে মলিন কোমল মুখখানি। নিশ্চিন্তে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে।

কি জানি কেন হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে দেওয়া আর হয় না। পায়ে পায়ে মেয়েটির কাছ থেকে সরে এসে জানলার সামনে দাঁড়ায় রাজা।

একটা সিগরেট ধরায়।

বাইরের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে সিগরেট টানতে থাকে।

সিগরেটটা শেষ করে অন্যমনস্কভাবে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, আবার নজরে পড়ে মেঝেতে শায়িত মেয়েটার দিকে।

ঘুমিয়ে পড়েছে।

কি আপদ! মেয়েটা কি এখানে তার এই ডেরাতেই পাকাপোক্ত ভাবে আসন গাড়ল নাকি! বিরক্তিতে মনটা যেন ভরে উঠে।

ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয় রাজার। ঘুরে ফিরে আবার দিব্বি তার এখানেই এসে হাজির হয়েছে!

এখুনি ঘুম থেকে তুলে সোজা গলায় ধাক্কা দিয়ে ঘরে থেকে বের করে দেবে নাকি!

কিন্তু অসহায় ঘুমন্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার মনে হয়, যাকগে—থাক আজকের রাতটা—কাল সকালে উঠেই রাস্তা দেখিয়ে দেবে। বলবে, যাও বাবা, পথ দেখ।

চোখে পড়ে আবার রাজার, হাতের উপর মাথাটা রেখে শুয়ে আছে মেয়েটা।

কি মনে হল রাজার, বিছানা থেকে একটা বালিশ তুলে ছুঁড়ে মেয়েটার গায়ের উপর ফেলে দিল। কিন্তু মেয়েটার কোন সাড়া নেই ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই।

বিরক্ত, একান্ত বিরক্ত হয়েই এবারে এগিয়ে গিয়ে মাথাটা তুলে বালিশটা মাথার নীচে দিয়ে দিতেই একটা হালকা স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধের ঝাপটা নাকে এসে লাগে রাজার।

চেনা চেনা গন্ধটা।

দামী একটা বিলাতী ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ।

মাথার তলায় নরম বালিশটা পেয়ে মেয়েটা যেন আরাম করে

শুল। একরাশ ছোট ছোট রেশমের মত চুল বালিশটার উপর যেন ময়ূরের পেখমের মত ছড়িয়ে পড়ল।

শীত করছে নিশ্চয়ই, হাত দুটো গুটোনো দুটো হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিয়েছে।

কি মনে হল, উঠে গিয়ে একটা চাদর এনে মেয়েটার গায়ে দিয়ে দিল।

এবার আলোটা ঘরের নিভিয়ে দিয়ে রাজা শয্যার উপরে এসে গা ঢেলে দিল। কিন্তু বালিশে মাথা দিতেই একটু আগের সে মিষ্টি ল্যাভেণ্ডারের গন্ধটা অন্ধকারে নাসারন্ধ্রে এসে ঝাপটা দিল আবার।

অন্ধকারে এপাশ আর ওপাশ করতে থাকে রাজা। ঘুম আসে না তো চোখে কিছুতেই। ঐ ল্যাভেণ্ডারের মিষ্টি গন্ধটাই যেন তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—মনের ঘুম কেড়ে নিয়েছে!

মনে পড়ছে সেই কালো মুখটা। ঠোঁটের উপর সেই ভারি গোঁফ।

এক আধটা টাকা নয়, নগদ করকরে দশ হাজার টাকা দেবে, মেয়েটাকে খুঁজে দিতে পারলে। চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীর একমাত্র মালিক।

কেমন দেখতে মেয়েটা যে মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে!

নাম তো বললে মধুছন্দা। নামের মধ্যে তো বেশ কবিত্ব রয়েছে।

দেখতে আর কেমন হবে, বড়লোকের আদুরে অহঙ্কারী চালিয়াৎ মেয়েগুলো যেমন হয় তেমনিই হয়তো। উদ্ধত, বাচাল। চোখেমুখে উগ্র প্রসাধনের চিহ্ন। কামানো ভ্রূ পেনসিল দিয়ে আঁকা, ঠোঁটে লিপস্টিক, নখে কিউটেক্সয়ের প্রলেপ।

উঃ, নসিয়েটিং ওগুলোকে দেখলেই যেন রাজার গা ঘিন ঘিন করে!

আধো আধো সুরে নেকু নেকু ভাব করে যখন কথা বলে তখন ইচ্ছা করে জোরসে গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয়।

তার উপর মধুছন্দা না কি সোনায় আবার সোহাগা, মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে ভুগছেন।

ফটোটা কালই মিত্তির সাহেবকে গিয়ে ফিরত দিতে হবে। বলে দেবে, পারব না আমি—অন্য কাউকে বলুন।

কিন্তু নাঃ ঘুম তো আসছে না কিছুতেই। সেই মিষ্টি ল্যাভেণ্ডারের গন্ধটা।

উঠে বসল রাজা। আলোটা জ্বালাল, তার পর পাশের ঘরে গিয়ে আলনায় ঝোলানো কোটের পকেট থেকে সিগরেটের প্যাকেটের সঙ্গে কি মনে হওয়ায় ফটো সমেত শুভঙ্কর মিত্তিরের খামটা নিয়ে ঘরে ফিরে এল।

টেবিলের সামনে বসে একটা সিগরেট ধরিয়ে খাম থেকে ফটোটা টেনে বের করল।

ফটোটা বের করে ফটোটার দিকে তাকিয়েই যেন চম্‌কে ওঠে রাজা।

একি! কে?

আশ্চর্য! আশ্চর্য—মিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে—তার পর ফটোটা নিয়ে মেয়েটি যেখানে শুয়েছিল মেঝেতে সেখানে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েটার মুখের পাশেই ফটোটা ধরে একবার মুখটা একবার ফটোটা পরীক্ষা করে।

ফটোটার সঙ্গে মুখটা মেলায়। না। ভুল হবার কোন কারণ নেই। ইনিই উনি। অর্থাৎ দুষ্মন্ত মল্লিকের পলাতকা মধুছন্দা এই।

হুঁ। তাহলে তুমিই মধুছন্দা।

আরে। একেই বলে বরাত।

দশ—দশ হাজার টাকা পায়ে হেঁটে একেবারে তারই ঘরে।

উঃ ভাগ্যে—ভাগ্যে—ফটোটা দেখেছিল রাজা। নচেৎ কাল

মেয়েটাকে তাড়িয়ে দেবার পর আফসোসে নিজের হাত নিজে কামড়াতে হত।

এখুনি বের হয়ে যাবে নাকি।

সোজা একটা ট্যাক্সী নিয়ে চলে যাবে কিড স্ট্রীটে শুভঙ্কর মিত্রের বাসায়।

বলবে তাকে, মিত্তির সাহেব, ও দশ হাজারে হবে না, চাপ দিয়ে টাকার অঙ্ক আরও বাড়ান। দশ নয়, বলুন, বিশ হাজার।

বিশ হাজার হেঁকে যদি ও পনের হাজারও পায় তো ব্যাস—এখানে আর নয়, সোজা কেটে পড়ছে অন্য কোথাও।

এ শহরে আর না। অন্য কোনখানে।

A new life? হ্যাঁ, রাজা নতুন করে আবার তার জীবন শুরু করবে।

যেখানে কেউ তাকে চেনে না, কেউ জানে না তাকে, এমন কোন জায়গায় গিয়ে নতুন জীবন শুরু।

রাজা আর একটা সিগরেট ধরাল।

মাথাটা গরম হয়ে উটেছে। সিগরেট টানতে টানতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে রাজা। না তাড়াহুড়ো করে কিছু করা হবে না। ভেবেচিন্তে যা করবার করতে হবে।

চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীটা নিশ্চয়ই শাঁসাল। নইলে এক কথায় অমন করে দশ হাজার টাকা দিতে চায়।

তারপর পুলিস। পুলিসেই বা খবর দিল না কেন! ফ্যামিলি প্রেসটিজ! উঁহু মনে হয় না। অন্য কোন কারণ—অন্য কোন রহস্যই নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে।

মধুছন্দার নাকি মাথার গোলমাল আছে। কই মনে হয় না তো তার। মনে তো হয় না মেয়েটির মাথার মধ্যে কোন গোলমাল আছে।

তার পর ঐ দুষ্মন্ত মল্লিক। দূর সম্পর্কের ভাই। দূর সম্পর্কের ভাইটি শুধুই কি কর্তব্যের খাতিরে এগিয়ে এসেছে।

রাজা আবার তাকাল ভূতলে শায়িতা, নিদ্রিতা মধুছন্দার মুখের দিকে।

থমকে দাঁড়াল। কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তার পরই নীচু হয়ে মধুছন্দাকে মাটি থেকে তুলে এনে নিজের শয্যায় শুইয়ে দিল।

অঘোরে ঘুমোচ্ছে মধুছন্দা।

মিটি মিটি হাসছে মধুছন্দা ঘুমের মধ্যে।

না, এত সহজে ব্যাপারটা রাজা মিটতে দেবে না।

ভাল করে আগে কৌশলে মধুছন্দার কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে হবে। জানতে হবে মধুছন্দার কথা। জানতে হবে ঐ দুষ্মন্ত মল্লিকের কথা। তা ছাড়া জানতে হবে চৌধুরী কোম্পানীর কথাটাও।

আবার আর একটা সিগরেট ধরাল রাজা।

কিন্তু মধুছন্দাকে নিয়ে কি করা যায় ও যদি কাল সকালে উঠে না থাকতে চায়। যদি বের হয়ে যেতে চায়। কেমন করে ওকে আটকাবে রাজা। কি বলে যেতে বাধা দেবে। কি বলে ধরে রাখবে এখানে।

ধরে তাকে রাখতেই হবে মধুছন্দাকে। তা সে যে ভাবেই হোক। এত বড় সুবর্ণ সুযোগ পায়ে হেঁটে তার মুঠোর মধ্যে এসে যখন হাজির হয়েছে, একি সে হারাতে পারে!

শুধু যেতে দেওয়া নয়, বেরুতেই দেওয়া হবে না। এখান থেকে কে জানে শুধু তাদের উপরেই নির্ভর করে নিশ্চিন্ত না থেকে দুষ্মন্ত মল্লিক যদি আর কারও এ ব্যাপারে সাহায্য নিয়ে থাকে।

অসম্ভব নয় কিছু। নিশ্চয়ই তাদের উপরে নির্ভর করে চুপচাপ বসে থাকবে না দুষ্মন্ত মল্লিক। যে লোক দশ হাজার টাকা খরচ করতে পারে সে শুধু শুভঙ্কর মিত্রের উপরেই নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে না। থাকতে পারে না।

পায়চারি করতে করতে, একটার পর একটা সিগরেট ধ্বংস করতে করতে কখন যে বাকী রাতটুকু শেষ হয়ে গিয়েছে জানতেও পারে নি রাজা। খেয়াল হল হঠাৎ রাস্তার দিককার ঘরের খোলা জানলাটার দিকে নজর পড়তে।

প্রথম ভোরের আলোয় বাইরেটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে ক্রমশ।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ভোর সোয়া পাঁচটা।

রাত আজকাল বড় হয়ে এসেছে। পাঁচটা নাগাদই বেশ আলো ফুটে ওঠে চারিদিকে।

দুষ্মন্ত মল্লিকও সারাটা রাত ঘুমোয় নি।

কলকাতা শহরেই নামকরা একটা হোটেলের চারতলার একটা ঘরে একটা সোফার উপরে ঝিম হয়ে বসেছিল।

সামনে গোল টেবিলটার উপরে মদের গ্লাস, একটা হোয়াইট-হর্সের প্রায়-সমাপ্ত বোতল ও গোটা চারেক সোডার বোতল।

ভেবে ভেবে কোনই সে কিছুর কূল কিনারা করতে পারছিল না।

যেদিন প্রথম সকালে ঘুম থেকে উঠে দুষ্মন্ত জানতে পারে কাটারীয়ার মুখে মধুছন্দা ঘরে নেই—তাকে সারা বাড়ির মধ্যে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে, তার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে!

সে কি রে—পাওয়া যাচ্ছে না কি?

হ্যাঁ বাবু—পাওয়া যাচ্ছে না দিদিমণিকে।

পাগলের মতই ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে এসে পাঁতিপাঁতি করে সারা বাড়ি খুঁজেছিল দুষ্মন্ত।

তার পর সারাদিন ধরে আশপাশ আট দশ মাইলের মধ্যে সর্বত্র খুঁজেছে তাকে, কিন্তু যখন কোথাও পাওয়া গেল না মধুছন্দাকে, আক্রোশে ক্ষোভে এবং হতাশায় দুষ্মন্ত যেন সত্যিই পাগল হয়ে ওঠে।

তার এত সাধের পরিকল্পনা তাহলে সত্যি সত্যিই বানচাল হয়ে গেল। হাতের নিশ্চিন্ত মুঠোর ভিতর থেকে মধুছন্দা তাহলে সত্যি সত্যিই পালিয়ে গেল।

না, না—এ কিছুতেই হতে পারে না। যেমন করে হোক যেখান থেকে হোক মধুছন্দাকে খুঁজে বের করতেই হবে তাকে।

কোথায় যাবে—কত দূরেই বা পালাবে? পথঘাট তো কিছুই

চেনে না! আগে ছিল বছর দশেক দার্জিলিং কনভেণ্টে, তার পর বছর দুই ছিল এণ্টালীর এক মিশনারী বোর্ডিংয়ে। কখন রাস্তায় বের হয় নি। কিছু জানে না রাস্তাঘাটের।

ঐ সময়েই একবার মনে হয়েছিল দুষ্মন্তর, পুলিসে একটা খবর দেবে কিনা! তার পরই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে—তাতে করে যদি উল্টো ফল হয়।

পুলিসের কাছে মধুছন্দা সব খুলে বললে, তার এতদিনকার সাজান ঘুঁটি হয়তো সব কেঁচে যাবে।

না, কাজ নেই ও পথে গিয়ে, কে জানে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ যদি বের হয় তো সর্বনাশ হবে, তার চাইতে সে-ই চেষ্টা করবে।

বোকামি হয়েছে। সত্যিই তার ওকে এতদিন জিইয়ে রেখে বোকামি হয়েছে, জোর করে যদি মেয়েটাকে বিয়ে করে নিত।

উঃ কি ভুলই সে করেছে, ভেবেছিল ঐভাবে বন্দী হয়ে কতদিন থাকতে পারবে—মাথা নোয়াতে বাধ্য হবেই একদিন। বিনা আয়াসেই তখন কার্যোদ্ধার করতে পারবে দুষ্মন্ত।

কিন্তু আশ্চর্য মেয়েটার জিদ্। কিছুতেই নোয়ানো গেল না। কিন্তু এখন উপায়। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মধুছন্দাকে খুঁজে না বের করতে পারলে হয়তো সত্যি সত্যি সব ভেস্তে যাবে।

তাছাড়া কিংশুক। যে-কোনদিন হয়তো কিংশুক ফিরে আসতে পারে।

আশ্চর্য!

কিংশুককে নিয়ে যে আর একটা জটিল জট পাকানো ছিল কে জানত।

স্বপ্নেও ভাবে নি কোনদিন দুষ্মন্ত ঐ দিক থেকে কোন দুশ্চিন্তার কারণ থাকতে পারে এবং ঐ কিংশুকই নলিনাক্ষ্য চৌধুরীর মনোনীত পাত্র। নচেৎ সে ব্যবস্থা সে আগেই করে রাখত।

কেবল একটা চিঠি।

একটা চিঠিতে মধুছন্দার মস্তিষ্কবিকৃতির কথাটা জানিয়ে দিলেই

সব লেঠা চুকে যেত, কারণ মধুছন্দার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে জানতে পারলে নিশ্চয়ই কিংশুক মধুছন্দার ছায়াও আর মাড়াত না।

মধুছন্দা যে রাত্রে নিরুদ্দিষ্টা হয়ে যায়, তার পরদিনই দুপুরে পাগলের মত যখন চারিদিকে দুষ্মন্ত মধুছন্দার খোঁজ করাচ্ছে কিংশুকের চিঠিটা তার হাতে এসে পৌঁছয়।

এবং চিঠিটা পড়ার পরই সব জানতে পারে দুষ্মন্ত মল্লিক।

চিঠিটা লিখেছিল কিংশুক মধুছন্দাকেই।

মধুছন্দা,

সত্যিই এবারে আমার ফিরে যাবার সময় হয়েছে। এখানকার শিক্ষা আমার শেষ হয়েছে। আজ মনে পড়ছে তিন বছর আগেকার একটা দিন যেদিন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিদেশের পথে পা বাড়িয়েছিলাম।

আজ তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আগে একটা কথা তোমায় জানানো দরকার। অবিশ্যি কাকাবাবু অর্থাৎ তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তিনিই তোমাকে বলতেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি যখন নেই আমাকেই কথাটা বলতে হচ্ছে।

তুমি তো জান যখন আমি পাঁচ বছরের মাত্র তখন আমার মাকে হারাই—আর ষোল বছর বয়সে বাবাকে!

বাবাকে হারানোর দুর্দিনের কথাটা আমি ভুলব না এবং সেই সঙ্গে চিরদিন মনে থাকবে আমার সেই পরম দুর্দিনে তোমার বাবার স্নেহ ও আশ্রয় না পেলে আজ যা হয়েছি তা হতে পারতাম কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ, আমার আজকের যা কিছু সাফল্য তাঁরই জন্য। তাই তাঁকে প্রণাম জানাই বারবার।

কিন্তু থাক্, যে কথা বলবার জন্য এই চিঠি, তুমিই আমার বাগদত্তা বধূ। বাগদান হয়েছিল তোমার বাবা ও আমার বাবার মধ্যে যখন আমার বয়স ষোল ও তোমার এগারো। স্থির ছিল বিলাতের শিক্ষা শেষ করে ফিরে গিয়ে তোমার আমার বিবাহ হবে।

জানো ছন্দা, এই কটা বছর বিদেশে তোমার মুখখানাই আমাকে সকল কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে, দিন গুণছি তাই কবে দেখা হবে আমাদের।

ইতি—

তোমার কিংশুক

একেবারে যে কথাটা জানত না দুষ্মন্ত মল্লিক তা নয়।

কানাঘুষায় শুনেছিল কথাটা দুষ্মন্ত কলকাতার বাড়িতে বসেই। কারণ তখন সে কলকাতার বাড়িতেই থাকত।

সলিসিটার মিঃ সান্ন্যালই বলেছিলেন, মধুছন্দার বাবা নলিনাক্ষ্য চৌধুরী নাকি পাকাপাকি ব্যবস্থাই করে গিয়েছেন তাঁর উইলে। তার একমাত্র কন্যার জন্য পাত্র তিনি মনোনীত করেই রেখে গিয়েছেন, সেই পাত্রের সঙ্গেই মধুছন্দার বিবাহ হবে। এবং শুনেছিল নলিনাক্ষ্য চৌধুরী তার বাল্যের বন্ধুপুত্র কিংশুককে তার বিলাত যাত্রার পূর্বে দিন দশেকের জন্য ঐ রাঁচির 'সানি ভিলাতে' এনে রেখেছিলেন এবং সেই সময় তাঁর মেয়ে মধুছন্দাকেও হোস্টেল থেকে নিয়ে গিয়ে রাঁচিতে রেখেছিলেন।

দুষ্মন্ত সেই সময়ই জানতে পারে নলিনাক্ষ্য যদিও কারো কাছে প্রকাশ করেন নি কথাটা তবু ঐ বন্ধুপুত্র কিংশুকের প্রতি তাঁর একটা গভীর স্নেহ আছে। ছোটবেলায় কিংশুকের বাবার মৃত্যু হয়েছিল এবং তার পর থেকে নলিনাক্ষ্যই কিংশুকের সব কিছু দেখা শোনা করছেন এবং নলিনাক্ষ্যই কিংশুকের গার্জেন।

কিংশুক ঘটিত ব্যাপারটা জানতে পেরে দুষ্মন্ত সত্যিই তখন একটু চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। এবং কিংশুক ঘটিত ব্যাপারটার মূল কোথায় জানবার জন্য তৎপরও হয়ে ওঠে। কিন্তু চিন্তার ব্যাপারটা ভগবানই যেন নিষ্পত্তি করে দিলেন। হঠাৎ করোনারী থ্রমবসিসে নলিনাক্ষ্য চৌধুরী মারা গেলেন এবং তার পরই কিংশুকের ব্যাপারটা জানতে পারে দুষ্মন্ত।

এবং এও লিখে গিয়েছেন তাঁর উইলে, তাঁর মেয়ে-জামাই-ই হবে কোম্পানীর অর্ধেক অর্ধেক করে অংশীদার।

আর তাঁর মেয়ের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার সেই থাকবে। জামাই বিজনেস হাতে নেবার পর সে বর্তমানে কলকাতার অফিসে যে পোস্টে আছে সেই পোস্টেই থাকবে ও নগদ বিশ হাজার টাকা ও কলকাতার একটা বাড়ি পাবে।

মিঃ সান্ন্যালের মুখে নলিনাক্ষ্যর উইলের ব্যাপারটা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্মন্ত ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠে।

এত বড় সম্পত্তির বলতে গেলে সে কিছুই পাবে না।

পাবে মাস মাইনার একটা চাকরী, নগদ বিশ হাজার টাকা আর কলকাতার একটা বাড়ি মাত্র।

না, না—তা হতেই পারে না।

চোখের সামনে ওঁর জামাই আর মেয়ে সব কিছু দখল করে নেবে।

দুষ্মন্ত এত কাঁচা ছেলে নয়। কটা দিন দুষ্মন্ত যেন পাগলের মতই চিন্তায় অস্থির হয়ে থাকে। একটা পথ তাকে খুঁজে বের করতেই হবে তা সে যাই হোক। এবং ভাবতে ভাবতেই দুষ্মন্ত তার পথ খুঁজে পায়।

নলিনাক্ষ্য চৌধুরীর মনোনীত জামাই যেই হোক না কেন—সেই মনোনীত পাত্রের সঙ্গে কিছুতেই সে মধুছন্দার বিবাহ হতে দেবে না। সে নিজেই মধুছন্দাকে বিবাহ করবে।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থির করে ফেলে আর কাল-বিলম্ব না করেই সে মধুছন্দাকে বিবাহ করে ফেলবে। তবে এও ভেবেছিল হয়তো মধুছন্দা বেঁকে দাঁড়াবে—আপত্তি জানাবে। তা জানাক। সে তাকে বিবাহ করবেই। এবং প্রয়োজন হলে জোর করেই করবে।

অবিশ্যি সুবিধাও হয়ে গেল, আইনত ঐ সময়টা দুষ্মন্ত চৌধুরীই কোম্পানীর সর্বে সর্বা থাকায়।

পুরাতন চাকর বাকরদের সে সরিয়ে দিল—নিজের লোক নিযুক্ত করল রাঁচির বাড়িতে এবং বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলে গাড়ি পাঠাল কলকাতার হোস্টেলে মধুছন্দাকে রাঁচিতে নিয়ে আসতে।

এলও মধুছন্দা কিন্তু দুর্ভাগ্য সব গেল দৈব্যচক্রে পণ্ড হয়ে।

কিন্তু তবু নিরুৎসাহ হয় না দুষ্মন্ত। একবার যখন খাঁচায় এনে পুরেছে মধুছন্দাকে দুষ্মন্ত—তাকে তার শিখোনো বুলিতে কথা বলতেই হবে।

আজ না হয় কাল। নিশ্চিন্তই ছিল দুষ্মন্ত।

কিন্তু হঠাৎ নিরুদ্দিষ্টা হল মধুছন্দা।

আর তার পরই এল কিংশুকের চিঠিটা বিদেশ থেকে।

এবং সেদিন কিংশুকের চিঠিটা পেয়ে যেন আফসোসের আর সীমা পরিসীমা থাকে না দুষ্মন্তর।

খানিকটা যে দুষ্মন্ত গোড়াতেই কিংশুকের ব্যাপারটা থেকে আন্দাজ করতে পারে নি তা তো নয়। তবে একটা সন্দেহ তার হয় নি যে ঐ কিংশুক রায়ই নলিনাক্ষ্যের মনোনীর জামাই।

সত্যিই যদি তা হত তবে—তবে সে নিশ্চেষ্ট হয়ে এমন করে থাকবে।

ওদিকটার প্রতি সে যে এতখানি অবজ্ঞা দেখিয়েছিল তাও কি দেখাত।

সঙ্গে সঙ্গে সে চিঠি দিয়ে কিংশুককে জানিয়ে দিত মধুছন্দার মস্তিষ্ক-বিকৃতির সংবাদটা।

সামান্য—সামান্য একটু ভুলের জন্য রাজসিংহাসন তার হস্তচ্যুত হতে চলেছে।

যদি সে জোর করেই মধুছন্দাকে বিবাহ করে ফেলত কিংবা একটা চিঠিও দিত কিংশুককে, কিন্তু এখন আর সে আফসোসের কোন ফল নেই।

তবু দুষ্মন্ত এত সহজে তার মুঠো খুলে দেবে না। শেষ পর্যন্ত না দেখে সে পিছিয়ে যাবে না।

আরও একটা ব্যাপার দুষ্মন্ত মল্লিক জানত না যে ঐদিনই ভোরের প্লেনে কিংশুক দেশে ফিরে আসছিল।

কলকাতাগামী বি. ও. এ. সি'র বিরাট আকাশচারী বোয়িংয়ের মধ্যে বসে কিংশুক কাচের জানালাপথে বাইরে তাকিয়ে ছিল ঘুমহীন চোখে। আকাশে মেঘের স্তরে স্তরে রাত্রি শেষের আলোর আভাস। অন্ধকার আকাশ যেন সবে আলোয় চোখ মেলছে। সেই আলো-ছায়ার দিকে তাকিয়ে কিংশুক মধুছন্দার কথাই ভাবছিল।

মাঝখানে আর মাত্র একটা দিন।

আজ কলকাতায় পৌঁছে আজই সে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়বে রাঁচীর দিকে, কারণ এখনও নিশ্চয়ই পুজোর ছুটি শেষ হয় নি, মধুছন্দা হোস্টেলে ফিরে যায় নি এখনও।

অবিশ্যি একবার সে হোস্টেলে সংবাদ নেবে।

চার বছর আগে সে শেষ দেখা দেখে এসেছে মধুছন্দাকে। এই চার বছরের অদর্শন যেন বক্ষের নিভৃতে তার বিরহের সিন্ধু সৃষ্টি করেছে। কিংশুকের মনে হয় যদি এই মুহূর্তে সে মধুছন্দার সামনে গিয়ে পৌঁছতে পারত, কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—মাত্র পনের দিনের সেই স্মৃতি অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে যায় নি তো মধুছন্দার কাছে। সে যেমন তাকে মনে রেখেছে মধুছন্দাও তাকে তেমনি মনে রেখেছে তো।

কিন্তু না। আবার মনে হয়, তাকি সম্ভব। ওখান থেকে চলে আসার আগের দিন সন্ধ্যায় বাগানে বেড়াতে বেড়াতে মধুছন্দার হাতটি ধরে যখন বলেছিল, ছন্দা, আমাকে তোমার মনে থাকবে তো?

ছন্দা কি বলে নি, তোমার মনে থাকবে তো আমাকে?

কলকাতায় নিজের বাড়িতে পৌঁছে হোস্টেলের মেট্রনকে ফোন করতেই যেন কিংশুকের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে।

সে শুধু জানতে চেয়েছিল মেট্রনের কাছ থেকে ফোনে, পুজোর ছুটির পর মধুছন্দা কি ফিরেছে হোস্টেলে ?

সঙ্গে সঙ্গে মেট্রন জবাব দেয়, মধুছন্দা !

হ্যাঁ—মধুছন্দা চৌধুরী।

সে তো কবে হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে—

সে কি ! হোস্টেল ছেড়ে গেছে মানে ?

কেন আপনি কি কিছুই জানেন না ?

কি ব্যাপার ?

তার তো মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—

কি ! কি বললেন ! একটা অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে যেন কিংশুক।

হ্যাঁ—সে তো প্রায় দু বছর হবে তার রাঁচীর বাড়িতেই বর্তমানে চিকিৎসাধীনে আছে।

আর কোন প্রশ্নই করতে পারে না কিংশুক। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে আর বের হয় না। হাত থেকে ফোনটা কেবল শব্দ করে মাটিতে পড়ে যায়।

টলতে টলতে পাশের চেয়ারটার উপরে বসে পড়ে। তার চোখের সামনে তখন সব কিছু যেন ঘুরছে। মধুছন্দা পাগল ! তার মস্তিস্ক-বিকৃত ঘটেছে।

পাগল হয়ে গিয়েছে মধুছন্দা ! এই চার বছর বিদেশে যাকে মনের সামনে রেখে সে শুধু কাজ করে গিয়েছে। তার সেই মনোনীত বধু—সে পাগল। মধুছন্দা পাগল !

উঠে পড়ে চেয়ার থেকে কিংশুক। অস্থির অশান্ত পদে পায়চারি করতে থাকে। দুকান ভরে তার কেবল মেট্রনের মুখনিঃসৃত সেই কথাটা যেন বাজতে থাকে, পাগল পাগল পাগল ! মধুছন্দা আজ পাগল !

না, এ হতে পারে না। এ মিথ্যা এ অসম্ভব।

কিংশুকের স্নান হল না, খাওয়া হল না—বিশ্রাম হল না—গ্যারেজ থেকে গাড়িটা নিয়ে এক ঘণ্টা পরেই বের হয়ে পড়ল।

রাঁচী, সোজা সে রাঁচীর দিকে গাড়ি চালাল। জানতে হবে তাকে ব্যাপারটা।

পরের দিন শেষ রাত্রের দিকে ধূলা ভর্তি গাড়ি ও উস্কোখুস্কো চেহারা নিয়ে মধুছন্দাদের রাঁচীর বাড়িতে এসে পৌঁছল কিংশুক।

এবং বাড়িতে ঢুকে কাটারীয়ার মুখেই ব্যাপারটা জানতে পারল কিংশুক। চার দিন থেকে মধুছন্দা নিখোঁজ। গত পরশু দুষ্মন্তও মধুছন্দার খোঁজে কলকাতা চলে গিয়েছে।

কিন্তু তুমি! তুমি কে? কিংশুক শুধায়।

আমি কাটারীয়া—দিদিমণিকে সর্বদা দেখাশোনা করতাম।

এ বাড়ির পুরানো ঝি চাকর দারোয়ানেরা সব কোথায় গেল। রাধা—শ্যামলাল—বুধন—

তা তো জানি না সাহেব—

তার পরই শুধায়, এ কথা কি সত্য?

কি কথা?

তার মানে তোমাদের দিদিমণির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল!

হ্যাঁ সাহেব।

আচ্ছা—এ বাড়ির বুড়ো সরকার হরদয়াল বাবু তিনিও কি নেই। তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

তিনি তো অনেক দিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন।

পুরোনো লোক কেউ নেই—

কিংশুক আর দাঁড়ায় না! সোজা এসে বাইরে আবার গাড়িতে উঠে বসে। আবার গাড়ি কলকাতামুখো ছোটে।

একটা ভুল হয়ে গিয়েছে তার। তাড়াতাড়িতে কথাটা একবারও মনে পড়ে নি কিংশুকের। দুঃসংবাদটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। চৌধুরী কোম্পানীর সলিসিটার মিঃ সান্ন্যালের সঙ্গে একবার তার দেখা করা উচিত ছিল সর্বাগ্রে।

তিনি শুধু চৌধুরী কোম্পানীর আইন পরামর্শদাতাই নন—মধুছন্দার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলেন। প্রৌঢ় মিঃ সুকান্ত সান্ন্যাল,

হয়তো তাকে সঠিক খবরটা দিতে পারেন

কলকাতায় পরদিন ফিরে স্নান করে কোনমতে এক কাপ চা খেয়ে কিংশুক ছুটল মিঃ সান্ন্যালের গৃহে।

বেলা তখন আটটা সুকান্ত সান্ন্যাল গৃহেই ছিলেন। কিংশুককে দেখে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে সুকান্ত সান্ন্যাল বলে ওঠেন, একি কিংশুক, কবে ফিরলে ?

পরশু প্লেনে। কিন্তু একি শুনছি মিঃ সান্ন্যাল ?

বোস—বোস, কিংশুক।

না—আপনি আগে সব আমাকে বলুন মিঃ সান্ন্যাল।

কি ?

আমি যা শুনেছি তা কি সত্যিই ?

কি শুনেছ ?

মধুছন্দার নাকি আজ দু বছর হল মাথার গোলমাল ঘটেছে ?

গম্ভীর হয়ে গেলেন মিঃ সান্ন্যাল। বললেন, মিথ্যা শোন নি কিংশুক।

তাহলে সব সত্যি ! সত্যিই মধুছন্দা পাগল হয়ে গিয়েছে ?

হ্যাঁ—অন্তত চার পাঁচজন বিশেষজ্ঞের তাই মত। তার পর একটু থেমে বললেন, কিন্তু তবু বলব কিংশুক, আমি কথাটা পুরোপুরি আজও বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করেন না !

না।

কেন ?

সে আমি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।

তাই যদি হয় তো আপনি কোন প্রতিকারের এতদিন চেষ্টা করেন নি কেন ?

চার পাঁচজন বিশেষজ্ঞ যেখানে বলছেন সে পাগল—সেখানে আমি কি করতে পারি বল ! তাছাড়া—

বলুন, থামলেন কেন ?

আজ পর্যন্ত মধুছন্দার সঙ্গে একটিবার দেখা করবারও পারমিশন পাই নি আমি দুষ্মন্তবাবুর কাছ থেকে।

সে কি ! কেন ?

ডাক্তারদের নাকি কঠিন নির্দেশ আছে কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। তবে তুমি এসেছ যখন—তুমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো—

সেইজন্যই তো গিয়েছিলাম এসেই রাঁচীতে ছুটে—কিন্তু—

কি, দেখা করতে দিল না বুঝি ?

মধুছন্দা নেই সেখানে।

সেকি !

হ্যাঁ—পাঁচ দিন হল সে নিরুদ্দিষ্টা বাড়ি থেকে।

নিরুদ্দিষ্টা !

হ্যাঁ।

দুষ্মন্ত মল্লিক কোথায় ?

সে নাকি কলকাতায় কাল এসেছে তার খোঁজে।

সুকান্ত সান্ন্যাল যেন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

॥ ১২ ॥

উঠুন, ভোর হয়ে গিয়েছে, আর কত ঘুমোবেন ? আপনার চা—

রাজার ডাকে মধুছন্দা কোন জবাব দেয় না। কেবল মাথার বালিশটা আর একটু ভাল করে আঁকড়ে নিয়ে আরামসূচক একটা শব্দ করে ফিরে শোয়।

বাঃ চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, উঠুন—আবার তাগিদ দেয় রাজা।

মধুছন্দা সাড়া না দিলেও মুখটা বালিসে একবার ঘসে চোখ বুজে বুজেই দ্বিতীয়বার আরামসূচক শব্দ করে, উঃ।

মধুছন্দা দেবী—

এবারে সে ডাকে মধুছন্দা বোজানো চোখের পাতা দুটো টেনে টেনে খুলে মিটি মিটি তাকায়।

মধুছন্দা—

সত্যি, সত্যি—এবারে পুরো তাকাল মধুছন্দা।

ঘুমভাঙ্গা চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি।

আপনার চা।

হাতে ধরা চায়ের কাপটা স্মিতহাস্যে এগিয়ে দেয় রাজা।

মধুছন্দা ততক্ষণ উঠে বসেছে, আপনি, আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

ধরুন চা-টা, বলছি।

চা ধরবার কিন্তু কোন আগ্রহই দেখায় না মধুছন্দা।

শুধু দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করে, কেমন করে জানলেন কই বললেন না।

চা-টা পাশের ত্রিপয়ের উপরে নামিয়ে রেখে সদ্য-ঘুমভাঙ্গা অগোছাল কেশে ঢাকা বাসি মুখখানার দিকে এবারে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে রাজা, একজন বলেছে—

একজন বলেছে?

হুঁ।

কে?

দুষ্মন্ত মল্লিক।

কে! কে বলেছে—যেন ভূত দেখার মতই চমকে বিস্ময়াভূত কণ্ঠে কথাটা বলে মধুছন্দা

দুষ্মন্ত মল্লিক।

পুনরাবৃত্তি করল রাজা তার কথাটা।

তা-তাকে আপনি চেনেন নাকি! আগে থাকতে চিনতেন?

না—গম্ভীর উদাসকণ্ঠে রাজা বলে, আগেও চিনতাম না আর এখনও সামান্য পরিচয়ের পর তাকে চিনি বা চিনতে পেরেছি বলতে পারব না

তার—তার মানে তার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে !

হ্যাঁ—মাত্র গতকালই দুপুরে তিনি আমার পরিচিত হয়েছেন।

আমার কথা কি বলেছেন ? কি বলেছে সে ?

সে অনেক কথা, চা খেয়ে নিন ; বলছি—

না—আগে বলুন।

চা-টা খেয়ে নিন না।

না—বলুন সে কি বলেছে আমার সম্পর্কে !

শুনবেন !

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন।

তাহলে তার আগে বলুন আপনার সত্য পরিচয়টা।

আমার আবার পরিচয় কি ! বলেছেই তো সে আমার নাম পর্যন্ত আপনাকে।

তা বলেছে। কিন্তু সব কথা বলবার আগে আমারও তো জানা দরকার আপনিই সত্যি সত্যি সেই মধুছন্দা চৌধুরী কিনা—বিখ্যাত কোল মাইন ব্যবসায়ী চৌধুরী এণ্ড কোংএর একমাত্র সত্বাধিকারীণী স্বর্গত মিঃ নলিনাক্ষ্য চৌধুরীর একমাত্র কন্যা মধুছন্দা চৌধুরীই কিনা !

হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমিই সেই।

তাহলে এবারে বলুন, কেন আপনি পলাতকা বাড়ি থেকে !

তার আগে বলুন সে আমার সম্পর্কে কি বলেছে।

সে আপনাকে খুঁজছে। আর আপনাকে যে কেউ খুঁজে দিতে পারলে সে নগদ করকরে দশটি হাজার টাকা দেবে।

ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে এবারে মধুছন্দা রাজার মুখের দিকে তাকায়, আপনি—আপনি তাহলে আমাকে ধরিয়ে দেবেন !

দশ হাজার টাকা তো কম নয়। আপনিই বলুন না—আপনি আমি হলে কি করতেন ?

কিন্তু কেন, কেন ধরিয়ে দেবেন ! আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করি নি ?

তা যদি বলেন তো ক্ষতি করেছেন বৈকি !

ক্ষতি করেছি। কি,—কি ক্ষতি আপনার আমি করেছি?

দশ হাজার টাকার লোভ জাগিয়েছেন আমার মনে। তাছাড়া আপনার যা অবস্থা—

আমার অবস্থা?

বিস্ময়ে মধুছন্দার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায়।

হ্যাঁ—ঐ অবস্থায় আপনার এভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে আসাটাও কি অন্যায় হয় নি। নিয়মিত চিকিৎসায় হয় ত আপনি একদিন সুস্থ—

কথাটা রাজার শেষ হল না। চেঁচিয়ে উঠে মধুছন্দা, সে বলেছে বুঝি আপনাকেও আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, আমি পাগল—। আপনি—আপনি বিশ্বাস করেন কথাটা। সত্যি আপনার কি মনে হয় আমি পাগল?

আমার বিশ্বাসে অবিশ্বাসে আপনার কি আসে যায়, আপনার নিজের লোকই যখন বলছে আপনি পাগল—

নিজের লোক। সে আমার নিজের লোক! কেউ নয় সে আমার। জোর করে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কৌশলে আমাকে সেখানে মিথ্যা কথা বলে নিয়ে গিয়ে—

বিয়ে করতে চেয়েছিল বোধহয় সে!

হ্যাঁ—হ্যাঁ—কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হই নি, তাই আমাকে ঘরে বন্দী করে রেখে দু-বছর ধরে পাগল সাজিয়ে রেখেছিল। ডাক্তার ডেকে এনে প্রমাণ করেছে আমি পাগল—

জলের মতই যেন অতঃপর সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় রাজার কাছে।

দশ হাজার টাকার পুরস্কারের ব্যাপারটা রাজার কাছে আর ঝাপসা অস্পষ্ট থাকে না। এবং কথাটা যে কত বড় মিথ্যে—কত বড় একটা ষড়যন্ত্র অতঃপর মধুছন্দার কথাগুলো শুনে বুঝতেও কিছু বাকী থাকে না রাজার।

কিন্তু ভাঙ্গে না সে, প্রকাশ করে না সে কিছুই মধুছন্দার কাছে। কপট গাম্ভীর্যে মুখটা ভার করে রাখে!

মধুছন্দা বলে, বিশ্বাস হল না বুঝি আমার কথাটা আপনার। কিন্তু কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না—সত্যিই কি আমাকে আপনার পাগল বলে মনে হচ্ছে।

এত তাড়াতাড়ি কি করে বলি—

কেন বলতে পারবেন না। আমি তো আপনার সঙ্গে কথা বলেই বলতে পারছি আপনি পাগল নন, তবে আপনিই বা কেন বলতে পারবেন না। বিশ্বাস করুন, সত্যি-সত্যিই আমি পাগল নই—সম্পূর্ণ সুস্থ আমি—পাগল নই আমি—পাগল নই—বলতে বলতে শেষের দিকে মধুছন্দার কণ্ঠস্বর কান্নায় যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়।

তার দুচোখের কোল বেয়ে অশ্রু নেমে আসে।

চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে—দাঁড়ান, আর এক কাপ গরম চা আপনার জন্য নিয়ে আসি। বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে রাজা চায়ের কাপটা তুলতে যেতেই মধুছন্দা বলে ওঠে কান্নাঝরা সুরে, না, না—চায়ের দরকার নেই আমার—আগে বলুন আপনি বিশ্বাস করেন কিনা আমার কথা।

হাতটা রাজার চেপে ধরে মধুছন্দা, বলুন!

মধুছন্দার মুখের দিকে তাকাল রাজা, কি বলব?

বলুন আপনি বিশ্বাস করেন কিনা সত্যিই আমি পাগল।

না।

করেন না!

না।

সত্যি বলছেন?

সত্যিই বলছি। হাত ছাড়ুন, চা নিয়ে আসি—

মধুছন্দা হাতটা ছেড়ে দিল রাজার।

আরো মিনিট কুড়ি বাদে।

দুজনে মুখোমুখি বসে একটু আগে চা পান শেষ করেছে।

মধুছন্দা খাটের উপরে বসে।

সামনের একটা চেয়ারে বসে একটা সিগরেট ধরিয়ে টানছিল রাজা নিঃশব্দে।

হঠাৎ এক সময় অর্ধদগ্ধ সিগরেটের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে মৃদুকণ্ঠে রাজা বলে, কিন্তু এভাবে তো চিরকাল কিছু আপনি বাইরে বাইরে থাকতে পারবেন না। একদিন না একদিন তো আপনাকে বাড়িতে ফিরতেই হবে—

কে বললে ফিরতে হবে। ফিরলে তো আমি—

বাড়ি ফিরে যাবেন না!

না।

তার পর?

কি তার পর?

তার পর কি করবেন?

যা হোক একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেব।

কি কাজকর্ম জুটিয়ে নেবেন?

যা হোক একটা—

মৃদু হাসে রাজা।

হাসলেন যে! কাজ আমি করতে পারব না আপনি মনে করেন?

মধুছন্দা দেবী, সোনার চামচটি নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছেন আপনি। চারিদিকে জন্মাবধি ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যই দেখেছেন—তার বাইরে রুক্ষ কঠিন পৃথিবীটার সঙ্গে আপনার কোন পরিচয় নেই বলেই ঐ স্বপ্নকথা বলতে পারছেন।

না, না—দেখুন না—দেখুন না আপনি আমাকে একটা কাজ দিয়ে আমি পারি কি না করতে।

কিন্তু আপনার বাবার বিরাট সম্পত্তিই বা আপনি ছেড়ে দেবেন কেন?

চাই না আমি বাবার সম্পত্তি—তুম্মন্তদা সব নিক।

অত সহজেই যদি সব কিছুর মীমাংসা আমরা করতে পারতাম মধুছন্দা দেবী! যাক গে সে কথা। একটা কথার জবাব দিন তো।

কি ?

আপনার আত্মীয়স্বজন কি কেউ আর নেই ?

আছেন এক মামা—

কোথায়। কোথায় তিনি থাকেন ?

এলাহাবাদে—

তাঁর ঠিকানা জানেন ?

না—তাছাড়া তাঁর সাহায্য আমি চাই না—

কেন ?

তিনি বিশ্বাস করে গিয়েছেন আমি পাগল—

ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করে মধুছন্দা।

সব কথা শুনে মৃদু হাসে রাজা।

হাসছেন যে ? মধুছন্দা শুধায়।

হাসছি এই জন্য যে আপনি বেশ প্যাঁচে পড়েছেন দেখছি। যাক গে সে কথা—তা ঐ মামাটি ছাড়া আর আপনার আপনার জন—বিশ্বাস করতে পারেন কাউকে এমন কেউ নেই।

আর কেউ ?

হ্যাঁ—অন্তত যাকে আপনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে পারেন ?

মধুছন্দা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

এবং হঠাৎই তার মনের পাতায় ভেসে ওঠে বুঝি ঐ সময় কিংশুকের মুখটা। ভেসে ওঠে তিন বছর আগেকার একটা স্মৃতি।

কিন্তু তার কথা ভেবেই বা আর কাজ কি হবে ?

নইলে একটা নয় দুটো নয় এতগুলো চিঠি তাকে সে লিখিল তার বিপদের কথা জানিয়ে, একটা চিঠিরও জবাব পেল না।

না। তার কথা আর মধুছন্দা ভাববে না।

সে তো তাকে মনে রাখে নি। তাকে আর ভেবে কি হবে ?

অথচ বাবা তারই সঙ্গে ওর বিবাহের ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছেন।

গত দু বছর ঘরের মধ্যে বন্দী অবস্থায় কিংশুকের প্রতি যে দুরন্ত

অভিমানটা তিল তিল করে তার বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে উঠেছিল সেই অভিমানের বশেই মাথা নাড়তে নাড়তে মধুছন্দা বলে, না—

নেই ?

আবার মাথা নাড়ে মধুছন্দা, না। আর কেউ নেই। তার পরই হঠাৎ প্রশ্ন করে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে মধুছন্দা, কিন্তু আপনি, আপনি আমাকে ধরিয়ে দেবেন না তো ?

রাজা মৃদু হাসে, কোন কথা বলে না। এবং আবার ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে।

মধুছন্দার সমস্ত ইতিহাস শুনে রাজার মনের মধ্যে ওর প্রতি যে একটু মায়া জাগছে না তা নয়। এবং সেই সঙ্গে দশ হাজার টাকার কথাটাও সে যেন ভুলতে পারছে না।

একটা আধটা টাকা নয়— দশ হাজার টাকা। আর দশ হাজারই বা কেন—ব্যাপার যা বুঝতে পারছে ও মধুছন্দাকে পাওয়ার জন্য দুষ্মন্ত মল্লিক হয়তো আরও দশ হাজারও দিতেও পিছপা হবে না। এমনি করে মুঠোর মধ্যে বলতে গেলে যে টাকা আজ তার উপস্থিত সেই টাকা সে ছেড়ে দেবে !

কেন ! কেন ছেড়ে দেবে সে এমন অনায়াস-লভ্য সৌভাগ্যকে। কি সম্পর্ক তার মধুছন্দার সঙ্গে। কোথাকার কোন বড়লোকের একটা উটকো মেয়ে। তার জন্য তারই বা মাথাব্যথা কেন !

কিছুই করতে হবে না।

শুধু একটু বের হয়ে গিয়ে শুভঙ্কর মিত্তিরকে একটা ফোন করে দেওয়া। তারপরই করকরে নগদ দশ হাজার টাকা।

কি ভাবছেন ?

উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করে মধুছন্দা রাজাকে।

য়্যাঁ। চমকে ওঠে যেন রাজা ঐ প্রশ্নে, কি বললেন ?

কি ভাবছেন ?

ভাবছি অতঃ কিম্ ! এর পর—

কিন্তু রাজার কথা শেষ হল না। বন্ধ দরজার গায়ে নক্ শোনা গেল।

চম্‌কে ওঠে মধুছন্দা, কে যেন নক্‌ করছে দরজায়।

হুঁ। আপনি এক কাজ করুন—পাশের ঘরে চলে যান—

পাশের ঘরে?

হ্যাঁ—একেবারে সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকে দরজা আটকে থাকুন ভিতর থেকে—

দরজায় আবার নক পড়ল।

রাজা তাড়া দেয়, যান—দেরি করবেন না—শিগ্‌গির—

মধুছন্দা চলে যায় পাশের ঘরে।

রাজা নতুন একটা সিগরেট ধরিয়ে এগিয়ে গিয়ে ধীরে সুস্থে দরজাটা খুলে দিল।

কিন্তু দরজা খুলতেই যেন থম্‌কে দাঁড়ায় রাজা। শুভঙ্কর মিত্র।

একি মিত্তির সাহেব। কি ব্যাপার—এই সকালে এই অধীনের কুটীরে?

কথা আছে রাজা সাহেব—

কথা!

হ্যাঁ—দরজাটা আগে বন্ধ করে দাও।

॥ ১৩ ॥

দরজাটা বন্ধ করে শুভঙ্কর মিত্তিরের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রাজা, কি ব্যাপার?

বেশ বড় কাতলা রাজা সাহেব। পাইপটা দুই ওষ্ঠের মাঝে চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বলে শুভঙ্কর।

বড় কাতলা!

হ্যাঁ, যদি কাজ হাসিল করতে পারো মোটা মুনাফা!

একটু খোলসা করে বলো সাহেব—

কালকের সেই ক্লায়েন্ট মল্লিকের কথা বলছি।

মল্লিক মানে—সেই দুষ্মন্ত মল্লিক?

তুমি চলে আসবার পর থেকেই ব্যাপারটা আমি নতুন করে ভাবতে থাকি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। এবং সন্ধ্যা বেলা তার হোটেলে যাই—সেখানে বেশ ভাল করে চেপে ধরতেই অনেক কথা বের হয়ে পড়ল।

কি রকম?

স্পষ্ট করে এখনও কিছু লোকটা ভাঙ্গে নি বটে তবে এটা বুঝেছি বেকায়দায় পড়েছে। খরচ করবে—কিন্তু লোকটা আস্ত একটি বাস্তু ঘুঘু।

হুঁ।

তাই বলছিলাম—দেখো রাজা সাহেব, যেমন করে হোক মেয়েটাকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। তোমার উপরেই যদিও আমার আসল ভরসা, তবু কাল রাত্রে রোশনলালকে ডেকেও ব্যাপারটা খোঁজখবর করতে বলেছি—

বেশ তো!

কথাটা বলে যেন একান্ত নির্বিকারভাবে নতুন একটা সিগরেটে অগ্নিসংযোগ করল রাজা।

শুভঙ্কর মিত্র আবার বলে, আরও কিছু টাকা চাই নাকি?

টাকা!

হ্যাঁ, বলো তো দিয়ে যাই।

না। দরকার হলে চেয়ে নেব।

ভাল কথা, মেয়েটার ফটোটা যে একবার চাই রাজা সাহেব।

ফটোটা?

হ্যাঁ, রোশনলাল একবার দেখতে চেয়েছে ফটোটা।

ফটোটা তো নেই কাছে।

নেই? কি করলে ফটোটা?

একজনকে কাল রাত্রে দিয়েছি। কেন তোমার মল্লিককেই বলো না আর দু একটা প্রিণ্ট দিতে।

তাই বলব আজ আসলে ! তুমি কি আজ অফিসে আসছ নাকি ?

না।

শুভঙ্কর অতঃপর বের হয়ে গেল।

দুষ্মন্ত মল্লিকও কেবলমাত্র বার্তাবহের শুভঙ্কর মিত্রের উপর ভারটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে নি। তার কি রকম একটা ধারণা হয়েছিল মধুছন্দা পালিয়ে কলকাতাতেই এসেছে। কলকাতা থেকে বেশী দূরে নিশ্চয়ই সে যায় নি। যাবেও না। তাই সোজা দুষ্মন্ত রাঁচী ও তার আশেপাশে মধুছন্দাকে পাতিপাতি করেও না খুঁজে পেয়ে কলকাতাতেই চলে এসেছিল।

কিন্তু কলকাতায় এসেও কি করবে, কোথায় যাবে, কোন পথে অতঃপর অগ্রসর হবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

কলকাতায় এসে দুষ্মন্ত মল্লিক উঠেছিল একটি নামকরা হোটেলে। কলকাতায় পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে নলিনাক্ষ্য চৌধুরীর যে বাড়ি ছিল এবং ইতিপূর্বে যেখানে সে কলকাতায় কাজে এলে বরাবর উঠত, সেখানে কিন্তু উঠল না দুষ্মন্ত।

আগে থাকতেই প্ল্যান করে এসেছিল ঐ বাড়িতে সে উঠবে না, কারণ প্রথমতঃ মধুছন্দার নিরুদ্দেশের ব্যাপরটা সে যেমন সকলের কাছ থেকেই গোপন রেখেছিল তেমনি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে জল শেষ পর্যন্ত যে গিয়ে অনেক দূর গড়াবে দুষ্মন্ত সেটাও জানত।

অবশ্য ব্যাপারটা সকলের কাছে গোপন রাখলেও একজনের কাছে গোপন করেনি নি দুষ্মন্ত মল্লিক। সে লোকটি হচ্ছে চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজার তারাপদ গাঙ্গুলি। গোপন করবার অবিশ্যি কারণও ছিল না, যেহেতু সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল ঐ তারাপদ গাঙ্গুলী, দুষ্মন্ত মল্লিকের দক্ষিণ হস্ত।

তারাপদর একটা ইতিহাস ছিল।

চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীর পাটনা অফিসের ম্যানেজার ছিল তারাপদ

গাঙ্গুলী, কিন্তু নলিনাক্ষ্য চৌধুরী তাঁর মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে তারাপদকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীর বহু টাকা সে চুরি করেছে দুই বৎসরে সেই কথা জানতে পেরে।

সকলেই তারাপদকে জেলে দেবার জন্য বলেছিল নলিনাক্ষ্যকে, কিন্তু তিনি কেবল তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে সরিয়ে দিয়েছিলেন কোম্পানী থেকে, জেলে দিতে চান নি।

কিন্তু নলিনাক্ষ্য চৌধুরী সেদিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি বা বুঝতেও পারেন নি তাঁর অফিসের ম্যানেজার ঐ তারাপদ আর একজনের হাতের পুতুল মাত্র ছিল।

আসল কলকাঠি নড়ছিল তারই সম্পূর্ণ অন্য হাতের কৌশলে। এবং সেই কলকাঠি নাড়ছিল তারই আশ্রিত, একান্ত বিশ্বাস ও স্নেহভাজন দূর সম্পর্কীয় বোনের ছেলে দুষ্মন্ত মল্লিক।

একান্ত দয়াপরবশ হয়েই একদিন পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় দুষ্মন্তকে যে শুধু নিজ গৃহে আশ্রয়ই দিয়েছিলেন নলিনাক্ষ্য তাই নয়, তাকে মানুষ করে নিজের কোম্পানীর কলকাতার অফিসে এ্যাসিসটেন্ট্ ম্যানেজারের পদেও বাহাল করেছিলেন।

তিনি জানতে পারেন নি যে ঐ সাপই দুধ কলা খেয়ে কাল সাপ হয়ে তাকে পিছন থেকে ছোবল হানবে।

সেটা তাঁর জানা থাকলে নিশ্চয়ই তিনি হয়তো তাঁর উইলে—যদি তার মৃত্যু ঘটে মধুছন্দার বিবাহের পূর্বে—তার রক্ষণাবেক্ষনের ভারটা ও কোম্পানীর ট্রাস্টিদের অন্যতম ট্রাস্টি হিসাবে দুষ্মন্তকে নিযুক্ত করে যেতেন না মধুছন্দার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত।

যাই হোক, নলিনাক্ষ্যর আকস্মিক মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে দুষ্মন্ত তারাপদকে পুনরায় ডেকে এনে কলকাতার অফিসে ম্যানেজার নিযুক্ত করে দিল।

দুষ্মন্তের মুখে মধুছন্দার নিরুদ্দেশের সংবাদ শুনে তারাপদই তাকে আশ্বাস দেয়, কিছু ভাববেন না স্যার—দেখুন না সব আমি ঠিক

করে দিচ্ছি। ও কোথায় যাবে, কতদূরেই বা যাবে, ঠিক আমি ওকে খুঁজে বের করব। আপনি একবার বার্তাবহর শুভঙ্কর মিত্তিরের সঙ্গে দেখা করুন, এদিকে আমিও অন্যপথ দেখছি—দুষ্মন্ত বলে, এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে যদি পারো তারাপদ, তো জেনো তোমার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

ব্যাস্—ব্যাস্—ঐটুকুই তারাপদর প্রতি দয়া রাখবেন স্যার। আপনি শুভঙ্করের সঙ্গে কিন্তু একবার দেখা করে আসুন।

কিন্তু—

আপনি যান দেখা করুন না, কাল আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

দুষ্মন্তকে আশ্বাস দিয়ে তারাপদ হোটেল থেকে বের হয়ে গেল এবং সেইদিনই রাত্রে এক জুয়ার আড্ডায় গিয়ে তারাপদ তার দীর্ঘ দিনের দোস্ত রোশনলালকে পাকড়াও করল।

রোশনলালের ছিল চোরাই মালের কারবার। এবং তারাপদ জানত রোশনলালের একটা বিরাট দল আছে। চোরাই কারবারের ভিতর দিয়েই একদিন রোশনলালের সঙ্গে তারাপদর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

টাকার জন্য রোশনলাল এমন কোন কাজ ছিল না যে করতে পারত না। রোশনলাল লোকটা ছিল জাতে পাঞ্জাবী।

কিন্তু দু-তিনটে ভাষায় সে অনর্গল কথা বলতে পারত। এবং লম্বা চওড়া এবং দেখতে সত্যিই সুপুরুষ ছিল লোকটা। দেখলে চট্ করে অন্য কিছু কারও মনে হত না। বরং মনে হত একজন ভদ্রলোকই বুঝি।

আসলে যদিও তার সত্যিকারের কারবারটা ছিল চোরাই মালের কারবার, লোক দেখানো একটা রেকর্ড, রেডিও, গ্রামোফোন ইত্যাদির দোকান ছিল ধর্মতলায়।

ধর্মতলার দোকানে চোরা কারবারীদের সঙ্গে কিন্তু সে কখনও দেখা করত না, কোন কথাবার্তাও বলত না ঐ সম্পর্কে। প্রয়োজনমত

লোকেরা দেখা করত ঐ ধর্মতলা অঞ্চলেই সোহ্‌রাবের সেণ্ট্রাল হোটেলের তিনতলার একটা পিছনের ঘরে—যেখানে নিয়মিত মধ্য-রাত্রের জুয়ার আড্ডাটা জমে উঠত।

তারাপদ সেই জুয়ার আড্ডাতেই রোশনলালকে গিয়ে ধরল মধ্যরাত্রে।

একটা টেবিলে জনা চার পাঁচ গোল হয়ে বসে খেলছিল। একপাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল রোশনলাল।

ব্যাক ব্রাশ করা চুল, ক্লীন সেভড্। পরিধানে দামী গ্যাব্যার্ডিনের স্যুট।

তারাপদকে দেখে সহাস্যে বলে ওঠে রোশনলাল, আরে তারাপদবাবু যে, কি খবর বলেন!

একটু দরকার ছিল—

জরুরী!

হ্যাঁ—

চলেন পাশের ঘরে যাওয়া যাক।

ঐ ঘরেরই সংলগ্ন একটা ছোট ঘর ছিল। রোশনলাল সেই ঘরের মধ্যেই তারাপদকে নিয়ে গিয়ে ঢোকে। একপাশে একটা সোফা সেট ও টেবিল ছাড়া ঘরে এমন কোন আসবাবপত্র ছিল না।

ঐ ঘরের ভিতর দিয়েই একটা দরজা ছিল যে দরজা দিয়ে সোজা একেবারে হোটেল থেকে ঘোরানো সিঁড়িপথে বাইরে চলে যাওয়া যেত।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একটা চেয়ার দেখিয়ে রোশনলাল বললে, বোসেন। তার পর বোলেন কি খবর?

খবর খুব দামী। চোরা কারবারের ব্যাপারে যে ধরনের ইঙ্গিতে কথাবার্তা হত সেইভাবেই ওদের কথাবার্তা চলল।

মাল। রোশনলাল শুধায়?

হ্যাঁ—

কি ধরনের মাল?

একেবারে জ্যান্ত মাল।

জ্যান্ত!

হ্যাঁ, একটা মেয়ে।

মেয়ে, কি ব্যাপার?

সংক্ষেপে তখন তারাপদ মধুছন্দার ব্যাপারটা বলে যায়।

সব শুনে রোশনলাল হেসে ওঠে।

হাসলেন যে? থতমত খেয়েই যেন একটু প্রশ্নটা করে তারাপদ।

হাসলাম—ও তো পুরানো খবর।

পুরানো খবর!

হ্যাঁ—মিত্তির সাহেব অলরেডি আমাকে বলেছেন।

তাই নাকি!

হ্যাঁ—তা ছাড়া রাজা সাহেবকে লাগানো হয়েছে। বলে রোশনলাল ঐদিনই দ্বিপ্রহরে বার্তাবহ অফিসের ব্যাপারটা বিবৃত করে।

তবে তো ভালই হলো। তা হলেও তুমি একবার কাল সকালে যদি হোটেলে মল্লিক সাহেবের সঙ্গে দেখা করো তো ভাল হয়।

না—তার চেয়ে বরং তুমি এক কাজ কর!

কি?

তোমার মল্লিক সাহেবকে কাল রাত্রে এখানে নিয়ে এসো।

এখানে!

হ্যাঁ—

কিন্তু সে কি আসবে? মানী লোক!

তা যা বলছ। কিন্তু তুমি তো জান তারাপদবাবু, রোশনলাল কখনও কোথাও যায় না। যা করবার এখানে বসে বসেই করে আর যার দেখা করবার দরকার আমার সঙ্গে সে এখানেই আসে।

তা জানি, কিন্তু—

তাকে বলো তার জন্যে আলাদা হয়ে কাজ করতে হলে তাকে এখানেই আসতে হবে।

বেশ, তবে তাকে তাই বলব।

হ্যাঁ, বলো।

পরের দিন রাত্রেই তারাপদ দুষ্মন্ত মল্লিককে নিয়ে এল রোশনলালের আড্ডায়।

॥ ১৪ ॥

রোশনলালের ওখানে তারাপদর সঙ্গে দুষ্মন্ত মল্লিকের যে আসবার খুব একটা ইচ্ছা ছিল তা নয়, কিন্তু কথায় বলে গরজ বড় বালাই।

ছোট ঘরটার মধ্যেই রোশনলালের সঙ্গে দুষ্মন্ত মল্লিকের দেখা হল। এবং দু-চারটে মামুলী কথাবার্তার পর দরদস্তুরের কথাবার্তা উঠতেই রোশনলাল একেবারে পনের হাজার টাকা হেঁকে বসল।

দুষ্মন্ত মল্লিকের তখন শিরে সংক্রান্তি। সে তাতেই রাজী হয়ে যায়।

অতঃপর রোশনলাল শুধায়, মেয়েটার ফটো যে চাই একটা।

সঙ্গেই এনেছি—এই নিন দুষ্মন্ত মধুছন্দার একটা ফটো বের করে দিল পকেট থেকে একটা লেফাফা সমেত।

ফটোটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রোশনলাল বললে, খপসুরৎ লেড়কী। আপনি আমাকে সাতটা দিন সময় দিন!

সাত দিন।

তা এতবড় শহরে একজনকে খুঁজে বের করতে হলে সময় একটু লাগবে বৈকি! রোশনলাল বলে।

বেশ।

তারাপদ ও দুষ্মন্ত মল্লিক চলে যাবার পর রোশনলাল ঘরের দেওয়ালে কলিং বেলটা টেপে।

একটু পরেই হোটেলের একজন ওয়েটার এসে ঘরে ঢুকল।

আব্দুল—

সাব্—

নীচের বারে মহেন্দ্র সিং আছে কিনা দেখ তো।

আছে।

এ ঘরে তাকে একবার পাঠিয়ে দে—

আব্দুল সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই মহেন্দ্র সিং এসে ঘরে ঢুকল।

বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। রোগাটে চেহারা। পরিধানে স্যুট, মাথায় পাগড়ি। চোখ দুটো লাল, দেখলেই বোঝা যায় বেশ কিছু টেনেছে।

মহেন্দ্র সিং।

ফরমাইয়ে।

একটা কাজ করতে হবে।

বোলিয়ে—

রোশনলাল তখন হাতের ফটোটা এগিয়ে দেয় মহেন্দ্র সিংয়ের দিকে, এই মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে হবে—

মহেন্দ্র সিং ফটোটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখে হঠাৎ বলে ওঠে, আরে এ কেয়া তাজ্জব—

কি ব্যাপার মহেন্দ্র সিং!

ইসকো মালুম হোতা হ্যায়—হ্যাঁ মালুম হোতা হ্যায় এ ছোকরী কো জরুর হাম দেখা।

কি বললে, তুমি একে দেখেছ!

হাঁ।

কোথায়?

ইয়ে তো হামারা ইয়াদ নেই আতা হ্যায়—লেকিন হাম দেখা, জরুর দেখা।

কোথায় দেখেছ মনে করতে পারছ না?

ঠারিয়ে, ঠারিয়ে সাব—হামকো শোচনে দিজিয়ে থোড়া। বলে

মহেন্দ্র সিং আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফটোটা দেখতে থাকে। ভ্রূ দুটো তার কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

রোশনলাল মহেন্দ্র সিংহের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ কুঞ্চিত ভ্রূযুগল মহেন্দ্র সিংয়ের সরল হয়ে এল।

সে বললে, হ্যাঁ—ইসকো হ্যাম দেখা—

মনে পড়েছে ?

হ্যাঁ—আজই দুপায়েরমে রাজা সাহেব কো ফ্ল্যাটকে দেখা—

রাজা সাহেবের ফ্ল্যাটে !

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্নটা করে রোশনলাল।

হ্যাঁ, রাজা সাহেবের ফ্ল্যাটে। জরুর, ওহি লেড়কী।

ঠিক মনে হচ্ছে তোমার তাই ?

হ্যাঁ—

কথাটা মিথ্যা বলে নি মহেন্দ্র সিং।

সত্যিই সে দেখেছিল ঐদিনই দ্বিপ্রহরে মধুছন্দাকে রাজার ফ্ল্যাটে একটা কাজে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে।

রাজা অবিশ্যি ঐ সময় ফ্ল্যাটে ছিল না। বাইরে বের হয়েছিল। মধুছন্দাই ছিল একাকী ফ্ল্যাটে।

মহেন্দ্র সিং গিয়ে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে রাজাই ফিরেছে ভেবে মধুছন্দা গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল।

দরজা খুলে অপরিচিত মহেন্দ্র সিংকে দেখে মধুছন্দা কিন্তু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না।

মহেন্দ্র সিংও কম বিস্মিত হয় নি।

রাজার পরিচিত জনেরা সকলেই জানে, বিচিত্র চরিত্রের এক মানুষ রাজা। নারী জাতটার সঙ্গে তার কোনরকম সংস্পর্শ নেই। এবং ঐ জাতটাকে যে কি প্রচণ্ড ঘৃণা করে রাজা কারোই সেটা অজানা ছিল না। সেই রাজার ঘরে অমন সুন্দরী এক যুবতী।

বিস্মিত হবারই তো কথা।

কয়েকটা মুহূর্ত তাই মহেন্দ্র সিংয়ের যেন বাক্য-স্ফূর্তি হয় না।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে মধুছন্দার মুখের দিকে মহেন্দ্র সিং।

মধুছন্দাই প্রথমে প্রশ্ন করে, কাকে চাই?

রাজা সাহেব আছেন?

রাজা সাহেব! বিস্মিত মধুছন্দা কথাটা বলে মহেন্দ্র সিংয়ের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, মানে এখানে তো রাজাই থাকে।

তখন পর্যন্ত মধুছন্দা রাজার নামটা জানতে পারেনি, তাই সে জবাব দেয়, না, সে বাড়িতে নেই—

ওঃ তা আপনি কে? আপনাকে তো চিনতে পারছি না, এখানে তো কোন দিন দেখি নি—

না, এখানে আমি এই কিছুদিন হল এসেছি।

ওঃ, তা বেশ—রাজা সাহেব আসলে বলবেন মহেন্দ্র সিং এসেছিল—

হঠাৎ ঐ সময় পশ্চাৎ থেকে রাজার কণ্ঠস্বর শুনে দুজনেই যুগপৎ ফিরে তাকায়।

আরে মহেন্দ্র সিং যে! কি ব্যাপার?

রাজা।

মধুছন্দা ততক্ষণে ভিতরে চলে গিয়েছে—

তোমার কাছে এসেছিলাম রাজা। মহেন্দ্র সিং বলে।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি?

দুজনে ততক্ষণে কথা বলতে বলতে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে।

ও কে রাজা? মহেন্দ্র সিং হঠাৎ প্রশ্ন করে।

কার কথা বলছ?

চোখটা ঘুরিয়ে এবারে মহেন্দ্র সিং কেবল একটা ইঙ্গিত করে।

ইতিমধ্যেই রাজা মহেন্দ্র সিংয়ের কৌতূহল সম্পর্কে তাকে কি জবাব দেবে মনে মনে স্থির করে ফেলেছিল।

বলে, আমার স্ত্রী—

কি বললে ?

মহেন্দ্র সিংয়ের কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট একটা অবিশ্বাসের সুর যেন।

রাজা আবার শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমার স্ত্রী—

তোমার স্ত্রী !

হুঁ।

তুমি বিয়ে করেছ দোস্ত ?

কেন—কোন অপরাধ হয়েছে নাকি তাতে—

আরে না, না,—অপরাধ হবে কেন ? ভাবছি—

কি ভাবছ।

সেই তুমি—যার জেনানা সম্পর্কে এতখানি নফরৎ ছিল, সেই রাজা সাহেব—

বিয়ে করল কি করে এই তো ! কিন্তু কি জন্যে এসেছিলে সিং এবারে বলো তো !

না—এমন কিছু নয়—

তবে !

এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম—অনেকদিন দেখা হয় না। তাই ভাবলাম একটু ঢুঁ মেরে যাই।

ব্যাস ?

হ্যাঁ—আর কি ! তা হলে দিনগুলো তোমার ভালই যাচ্ছে বলো দোস্ত !

তা যাচ্ছে।

ওরা দুজনে রাজা আর মহেন্দ্র সিং এদিককার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল আর ঠিক ঐ সময় ওপাশের ছোট ঘরটায় দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনতে শুনতে কাঠ হয়ে যেন দাঁড়িয়ে ছিল মধুছন্দা।

সমস্ত কপালে তখন তার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। প্রথমত চমকে উঠেছিল মধুছন্দা রাজার কথা শুনে, সে তার স্ত্রী। তার পর

ওদের পরস্পরের কথাবার্তা থেকে ও বলার ধরন ও কণ্ঠের সুর থেকেই কেমন যেন মনে হয় মধুছন্দার সাধারণত তার পরিচিত ও জানাশোনা ভদ্র শিক্ষিত জন বলতে যা বোঝায় এরা তাদের দলের কেউ নয়। এরা সম্পূর্ণ অন্য এক জাতের লোক।

সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত একটা ভয় যেন কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলে মধুছন্দাকে। স্বেচ্ছায় এসে সে এ কোন গর্তে পা দিল! এক শয়তানের খপ্পর থেকে তবে কি সে আর এক শয়তানের মুঠোর মধ্যে এসে পড়ল।

স্ত্রী বলেই বা পরিচয় দিল কেন লোকটা তাকে! কি মতলব আছে ওর মনের মধ্যে। নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে, তাই মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তাকে এখানে এভাবে আটকেছে।

মহেন্দ্র সিং বলে, তা সাদী করলে দোস্ত—মালও খাসা পেলে—এবারে একদিন সকলকে আমাদের সেণ্ট্রাল হোটেলে পেট ভরে খাইয়ে দাও।

হবে—হবে—রাজা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মহেন্দ্র সিংহকে তাড়াতে পারলে যেন তখনই হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

হবে না—বল কবে?

শিগ্‌গিরী হবে—

আজ একবার আড্ডায় এসো না হে—

যাব। এখন তুমি এসো। আমার কাজ আছে—।

সে কি আর বুঝতে পারছি না। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসে মহেন্দ্র সিং, আচ্ছা তাহলে চলি—

মহেন্দ্র সিং বের হয়ে গেল।

রাজা তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটা বন্ধ করে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

সবে একটা সিগরেট প্যাকেট থেকে বের করে ধরাতে যাবে রাজা, পাশের ঘর থেকে মধুছন্দা বের হয়ে এল এবং সোজা সে কোন কথা না বলে দরজার হাতলে গিয়ে হাত রাখতেই চিন্তিত রাজা শুধায়, ও কি,দরজা খুলছেন কেন ?

ফিরে দাঁড়িয়ে হাতলে হাত রেখেই গম্ভীর কণ্ঠে বলে মধুছন্দা, আমি চলে যাচ্ছি—

চলে যাচ্ছেন !

হ্যাঁ—

হঠাৎ। কি হল ?

কি হল ? মধুছন্দার দু চোখে যেন অগ্নিদৃষ্টি।

হাঁ—হঠাৎ যাবার জন্য উদ্যত কেন ?

ভবে কি আপনি মনে করেছিলেন নাকি আপনার স্ত্রী হয়ে এখানে থেকে যাব চিরদিন !

হঠাৎ হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে রাজা।

মধুছন্দা যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে রাজার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

রাজা হাসতে হাসতেই বলে, আচ্ছা পাগল তো !

পাগল।

হুঁ, আপনি নির্ঘাৎ পাগল—দুষ্মন্তবাবু ঠিকই ধরেছিলেন। বসুন —বসুন—ঐ চেয়ারটায় বসুন, মাথা ঠাণ্ডা করুন।

না। তীব্র ঝাঁঝালো কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে ওঠে মধুছন্দা।

বসবেন না ?

না, না—না—

এখন বুঝতে পারছি সত্যি সত্যিই আপনার মাথার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে !

হঠাৎ যেন সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ক্ষেপে ওঠে মধুছন্দা, কি! কি বললেন! আমার মাথার গোলমাল আছে?

তা আছে বৈকি।

সামনের টেবিলের উপরে যে পিতলের সুদৃশ্য ভারী ছাইভর্তি এ্যাসট্রেটা ছিল, হঠাৎ সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে মধুছন্দা বলে, I will Kill you!

আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান—মারবেন না, মারবেন না ওটা ছুঁড়ে। রাখুন, রাখুন—টেবিলের উপরে ওটা রাখুন। আমি—আমি ঠাট্টা করছিলাম—

আবার যদি কখনও ঐ কথা বলেন তো খুন করব আপনাকে আমি। রাগে ফুঁসতে থাকে মধুছন্দা।

না, আর বলব না—এবারে বসুন আপনি—এখন বুঝতে পারছি—

তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় মধুছন্দা রাজার মুখের দিকে। হাতের মধ্যে ধরা তখনও তার এ্যাস্‌ট্রেটা। সমস্ত হাতটা ছাইয়ে নোংরা হয়ে গিয়েছে কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই।

রাজা আবার বলে বুঝতে পারছি আমাদের সব কথা আপনি শুনেছেন কিন্তু একটা কথা আপনার জানা দরকার মধুছন্দা দেবী।

জানবার আর আমার কিছু নেই। সব আমি জেনেছি—

না জানেন নি। তা ছাড়া রাজা ব্যানার্জীকে আপনি ঠিক চেনেন না—

এখনও চিনতে আপনাকে বাকি আছে আপনি বলতে চান!

চাই বৈকি। কারণ তা যদি জানতেন আপনি আমাকে, সত্যি সত্যি যদি চিনতেন তো এতবড় ভুল আপনার হত না।

ভুল।

হ্যাঁ, ভুল মিস্ চৌধুরী, রাজা ব্যানার্জী আর যাই করুক জানবেন ঐ ফাঁদে, মানে আপনাদের ফাঁদে জ্ঞান থাকতে পা দেব না।

কি বললেন।

বলছি, নিজেদের সম্পর্কে আপনাদের মেয়েদের যতই উঁচু ধারণা থাক না কেন—আমার কাছে তার এক কানা কড়িও মূল্য নেই।

কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে অতঃপর চেয়ে থাকে মধুছন্দা রাজার মুখের দিকে।

রাজা হাতের সিগরেটের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, রাজা ব্যানার্জী, দুশ্চরিত্র জুয়াড়ী অশিক্ষিত হতে পারে কিন্তু এত বড় নির্বোধ নয় যে সে এত বড় ভুলটা করবে এবং সেই জন্যই আপনাদের জাতটা সম্পর্কে জীবনে এই অধমের আজ পর্যন্ত কখনও কোন কারণে যেমন দুর্বলতা জাগে নি—ভবিষ্যতেও জাগবে না।

থামুন, থামুন—আপনাদের পুরুষ জাতটাকে চিনতে আর আমার বাকী নেই—বিশ্বাস করি না আমি আপনাদের—

বিশ্বাস করেন না!

না।

বেশ। নাই করলেন—কিন্তু গট গট করে তো চলেছিলেন মিলিটারী হাইল্যাণ্ডের মত জানতে পারি কি যাচ্ছিলেন কোথায়?

কোথায় আবার! যেখানে খুশি।

তা অবিশ্যি যেতে পারেন। কিন্তু এর মধ্যেই ভুলে গেলেন নাকি সকালের কথাগুলো। শুভঙ্করের লোকেরা চারিদিকে এতক্ষণে ছড়িয়ে গিয়েছে—

রাজার শেষ কথাগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দপ্ করে যেন নিভে যায় মধুছন্দা। মুখটা দেখতে দেখতে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

রাজা বুঝতে পারে ঔষধ ধরেছে। সে অলস হাতে আর একটা সিগরেটে অগ্নি সংযোগ করে।

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে ভীরু কণ্ঠে বলে মধুছন্দা, কে বললে?

আমি জানি। তাছাড়া ভুলে যাচ্ছেন কেন দুষ্মন্ত মল্লিক আজ দুহাতে টাকা ছড়াচ্ছে আপনার জন্য, তার পণ জীবিত বা মৃত সে আপনাকে করায়ত্ত করবেই—

থপ্ করে এবারে মধুছন্দা চেয়ারটার উপরে বসে পড়ে।

ঝোঁকের মাথায়, রাগের মাথায় যে কথাটা, যে সম্ভাবনাটা একবারও তার মাথার মধ্যে উঁকি দেয় নি এখন সেই দুষ্মন্ত মল্লিকই যেন মূর্তিমান একটা বিভীষিকার মত তার সামনে এসে দাঁড়ায়, মুখটা শুকিয়ে যায় মধুছন্দার।

শুনুন, আপনি বুঝতে পারবেন না কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আপনাকে খুঁজে বের করার জন্য চারিদিকে এতক্ষণে শুভঙ্কর মিত্তিরের গুপ্তচরেরা হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। এখান থেকে আপাততঃ কোথাও বের হবেন না, যদি বাঁচতে চান দুষ্মন্ত মল্লিকের হাত থেকে। তার পর আমাকে ভাবতে দিন—আপনার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে—

নিঃশব্দে মাথা নীচু করে বসে থাকে মধুছন্দা।

তার পর একসময় আবার মুখ তুলে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে কিন্তু তাতে আপনার লাভ কি?

কি বললেন লাভ!

হ্যাঁ—আপনার লাভ কি?

রাজা মৃদু হেসে বলে, কথাটা মিথ্যে বলেন নি সত্যিই তো আমার লাভ কি? বরং আপনাকে তার হাতে তুলে দিতে পারলে মোটা টাকাই পকেটে আসবে আমার।

ধরিয়ে দেবার কথায় যেন হঠাৎ আবার চমকে ওঠে মধুছন্দা। বলে, ধরিয়ে দেবেন আমাকে?

ধরিয়ে দেব না বললেই কি আপনি বিশ্বাস করবেন মিস চৌধুরী?

করব নিশ্চয় করব।

করবেন।

হ্যাঁ।

তবে ধরিয়ে দেব না—কিন্তু এক শর্তে!

শর্তে!

হ্যাঁ।

কি শর্তে ?

আগে বলুন রাজী আছেন কিনা শর্ত পালনে—তাহলে বলব।

রাজী।

ঠিক তো ?

ঠিক।

আমাকে তাহলে আর আপনি অবিশ্বাস করতে পারবেন না।

বেশ।

যা বলব তাই শুনবেন ?

শুনব।

এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা। Good girl ! খুব ভাল মেয়ে। মধুছন্দা ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।

মধুছন্দা রাজার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়।

চোখের কোল দুটো তখন তার ছল ছল করছে।

॥ ১৬ ॥

আর ঠিক সেই সময়।

রাজা মধুছন্দার দুটি ছলো ছলো চোখের দিকে কেমন যেন চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটু আনমনা হয়েছে—

ঐ সময় বন্ধ দরজার গায়ে নক্ পড়ল।

মধুছন্দা দরজার গায়ে আবার নক্ শুনে চম্‌কে ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে বন্ধ দরজার দিকে তাকায়।

কিন্তু রাজা ওর দিকে তাকাল না, এগিয়ে গেল দরজার দিকে এবং শুধাল, কে ?

আমি। মহেন্দ্র—

মহেন্দ্র সিং আবার ফিরে এসেছে।

ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে রাজার।

মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে, তার পরই দরজাটা খুলে দেয় মহেন্দ্র ফিরে এলে যে !

মহেন্দ্র দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দেয়—কিন্তু তার চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মধুছন্দার চোখের দৃষ্টি মিলবার আগেই মধুছন্দা শাড়ির আঁচলটা তুলে মাথায় ঘোমটা টেনে দেয়।

আমার সিগারেট কেশটা দেখো তো রাজা সাহেব, তোমার ঘরে ফেলে গিয়েছি কি না ?

সিগারেট কেস ?

হ্যাঁ—

মহেন্দ্র এসে ঘরে ঢোকে এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজার নজর পড়ে মধুছন্দার দিকে।

মাথায় ঘোমটা টেনে তখনও সে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে।

মহেন্দ্র একবার আড়চোখে মধুছন্দার দিকে তাকিয়ে ঘরের চারিদিকে সিগারেট কেসটা খোঁজে, কিন্তু সেটা পাওয়া যায় না।

মহেন্দ্র আপন মনেই বলে, না—এখানে তো নেই—তবে পড়ল কোথায় !

একদৃষ্টে এতক্ষণ রাজা মহেন্দ্রকে লক্ষ্য করছিল। সে এবারে শান্ত কণ্ঠে বলে, তোমার পকেটে দেখো—

আমার পকেটে !

হ্যাঁ—দেখো না।

মহেন্দ্র পকেটে হাত দিতেই সিগারেট কেসটা বের হয়ে আসে। একটু যেন অপ্রস্তুত হাসি হেসে মহেন্দ্র বলে, তাই তো পকেটেই তো ছিল দেখছি—

হ্যাঁ মহেন্দ্র সিং, পকেটেই যে ছিল সিগারেট কেসটা সে তুমি জানতে।

থতমত খেয়ে মহেন্দ্র রাজার দিকে তাকিয়ে বলে, জানতাম !

জানতে বৈকি।

না, না—মানে—

এবার এসো—শান্ত স্থির কণ্ঠে কথাটা বলে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল রাজা।

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রাজা আবার এগিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে করতে বারান্দায় চলমান মহেন্দ্র সিংকে উদ্দেশ্য করে বলে, মহেন্দ্র আর কিছুর জন্য যেন ফিরে এসো না—

কথাটা বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল।

মধুছন্দা তার ঘোমটা টেনে সরিয়ে দিল মাথা থেকে।

মহেন্দ্র রোশনলালকে আনুপূর্বিক ঘটনাটা বলে গেল।

সত্যি বলছ সিং! রোশনলাল শুধায়।

সত্যি।

রোশনলাল ঘরের মধ্যে পায়চারি করেতে থাকে।

মহেন্দ্র সিং দাঁড়িয়ে থাকে ফটোটা তখনও হাতে নিয়ে।

হঠাৎ একসময় পায়চারি থামিয়ে রোশনলাল মহেন্দ্র সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, ঠিক আছে। দাও ফটোটা, তুমি এখন যেতে পারো।

মহেন্দ্র সিং ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পরের দিন বেলা তখন আটটা হবে। পাশের ছোট ঘরে মধুছন্দা ইলেকট্রিক স্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে চায়ের সরঞ্জাম সব সাজাচ্ছে আর রাজা ঘরের মধ্যে বসে ঐ দিনকার সংবাদপত্র তন্ন তন্ন করে পড়ছে, এমন সময় হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের উপরে নজর পড়ল রাজার।

ছবি সমেত একটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞপ্তি বের হয়েছে।

ছবিটা মধুছন্দারই, এবং বছর পাঁচেক আগেকার হলেও চিনতে কষ্ট হয় না মধুছন্দাকে ফটো থেকে।

বিজ্ঞাপনদাতার নাম নীচে লেখা কিংশুক রায়।

উপরের ছবিটি মধুছন্দা চৌধুরীর। যদিও বছর চার পাঁচ

আগেকার ছবি। মেয়েটির বর্তমান বয়স উনিশ কুড়ির মধ্যে, রোগা, দীর্ঘাঙ্গী, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। মাথায় সামান্য ছিট্ আছে। আজ প্রায় ছয়দিন হল সে তাদের রাঁচীর চৌধুরী ভিলা থেকে নিরুদ্দিষ্টা। যদি কোন ভদ্রমহোদয় ঐ ছবির মালিকের কোনরূপ সন্ধান দিতে পারেন তাহা হইলে তাহাকে নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। সন্ধান পাইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায়, কিম্বা পুলিস কমিশনার লালবাজার অথবা স্টেশন ডাইরেক্টর, অল ইণ্ডিয়া রেডিও খবর দিন।

কিংশুক রায়।

৩৩নং পার্ক সার্কাস।

বিজ্ঞাপনটা একবার পড়েই রাজা চিৎকার করে ডাকে, ছন্দা, ছন্দা দেবি—

মধুছন্দা তাড়াতাড়ি ছুটে আসে এ ঘরে, কি! কি হল?

আবার?

আবার! কি আবার?

আবার দশ হাজার টাকা।

কিসের দশ হাজার টাকা। কি বলছেন!

বলছি আর কি! কমলি নেহি ছোড়্তা—

মানে।—

আর মানে, এখন ভাবছি—মরতে কেন আপনাকে কথা দিলাম। নচেৎ দশ-দশ দু দফায় বিশ হাজার টাকা সোজা হাতে এসে যেত।

দুঃখ হচ্ছে বুঝি?

তা আর হবে না, বিশ হাজার টাকা সোজা কথা!

তা যান না—রোজগার করে নিন না টাকাটা—কিন্তু ব্যাপারটা কি?

এই দেখুন—এই বিজ্ঞাপনটা পড়ুন।

বিজ্ঞাপন!

হ্যাঁ—

কিসের?

দেখুন না পড়ে।

বিজ্ঞাপনটা দেখেই মধুছন্দা বলে, একি এ যে আমারই ছবি।

আপনারই তাহলে নিঃসংশয়ে।

হ্যাঁ—আমার আগেকার তোলা ফটো।

কথাটা বলে মধুছন্দা বিজ্ঞাপনটা আগাগোড়া পড়ে এবং পড়তে পড়তে মুখটা তার গম্ভীর হয়ে যায়।

বিস্মিত রাজা শুধায়, কি হল?

না কিছু না, মধুছন্দা বলে।

মিস্ চৌধুরী!

কেমন যেন অন্যমনস্ক চিন্তিত মধুছন্দা।

রাজা আবার ডাকে, মিস্ চৌধুরী?

কি?

মধুছন্দা মুখ তুলে তাকাল।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব জবাব দেবেন?

কি।

এই বিজ্ঞাপন দাতা কিংশুক রায়টি কে?

পূর্ববৎ গম্ভীর কণ্ঠে মধুছন্দা বলে, কে আবার। কেউ না।

কেউ না!

না।

তবে উনি ঐ রকম বিজ্ঞাপন দেন কেন?

সে আমি কি করে বলব, ওকেই গিয়ে শুধিয়ে দেখুন না। ঠিকানা তো দেওয়াই আছে।

তা তো আছে। তা একটা কাজ করলে হয় না?

কি?

চলুন না দুজনে পার্ক সার্কাস থেকে একবার ঘুরে আসি!

বিজ্ঞাপনটা পড়ার সঙ্গেই সঙ্গেই নিদারুণ একটা অন্ধ-অভিমানে মধুছন্দার বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠেছিল।

কিংশুক—কিংশুকও বিশ্বাস করেছে সে পাগল। আর দশজনের

মত সেও জানে নিশ্চয় কথাটা। ঠিক আছে। সে পাগল যখন পাগলই থাকবে। কারও সঙ্গেই সে কোন সম্পর্ক রাখবে না।

কঠিন কণ্ঠে বলে, আমার যাবার কোন প্রয়োজন নেই। যেতে চান, আপনি যেতে পারেন। কথাটা বলে মধুছন্দা আর দাঁড়ায় না।—পাশের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

আরে শুনুন, শুনুন—

রাজার ডাকে মধুছন্দা আবার ঘুরে দাঁড়ায়, কি?

সত্যি সত্যি—চলুন না একবার ঘুরে আসি পার্ক সার্কাস থেকে—

বললাম তো—যেতে হয় আপনি যান। কিন্তু কেন বলুন তো? এই যে কাল বলেছিলেন যেমন করে হোক আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন—সে ইচ্ছাটা বুঝি আর এখন নেই—

কি বলছেন!

ঠিকই বলছি। একদিনেই বুঝি আপনার গলগ্রহ হয়ে উঠেছি—

ছিঃ ছিঃ—

জানি, জানি, বুঝতে কি আর পারছি না, বুঝতে পারছি। সত্যিই তো কে আমি আপনার—কে—রাস্তা থেকে—

ছিঃ ছিঃ মধুছন্দা দেবি, এ আপনি কি বলছেন। তা নয়—

তবে কি শুনি?

একদিন ছেড়ে এক মাস এখানে আপনি থাকুন কিন্তু আমাকেও তো আপনি একেবারেই চেনেন না। তবে কোন দুঃসাহসে এখানে থাকবেন? তাছাড়া আমিই বা কোন সাহসে এখানে ধরে রাখব! তার চাইতে বরং চলুন একবার পার্ক সার্কাসে ঐ কিংশুক রায়ের সঙ্গে—

না, না—

বেশ। আপনি না যান আমিই যাব?

কিছুতেই না—কিছুতেই সেখানেই আপনি যেতে পারবেন না—আপনি জানেন না—সেও ঐ দুষ্মন্তদারই দলে—

কিন্তু—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—পড়লেন না বিজ্ঞাপনটা—আমার মাথার ছিট্ আছে—আমি পাগল—

কিন্তু সত্যিই তো। আপনার মাথার ছিট্ নেই—আপনি পাগল নন। আমি বলব—আমি প্রমাণ করব—

কিন্তু রাজার কথা শেষ হল না, দরজায় ধাক্কা পড়ল ও সেই সঙ্গে পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেল, রাজা সাহেব!

কণ্ঠস্বরটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চম্‌কে ওঠে রাজা।

দরজার বাইরে থেকে একবারমাত্র শুনেও ঐ কণ্ঠস্বর চিনতে তার ভুল হয় নি। রোশনলালের কণ্ঠস্বর।

॥ ১৭ ॥

রাজা কি করবে, কি জবাব দেবে যেন বুঝতে পারে না।

হঠাৎ যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের স্পর্শে ওর সমস্ত শরীরটা একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে।

রোশনলাল!

আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল, রাজা সাহেব আছো নাকি! আমি রোশনলাল—

কেমন যেন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে তাকায় রাজা তার সামনেই দণ্ডায়মান মধুছন্দার দিকে।

রোশনলালকে রাজা খুব ভাল করেই চেনে। মহেন্দ্র সিংয়ের মত অত সহজে তাকে এড়ানো যাবে না। কিন্তু ভেবে পায় না রাজা হঠাৎ রোশনলালের তার ফ্ল্যাটে আবির্ভাব ঘটল কেন?

তবে কি রোশনলাল মধুছন্দারই খোঁজে এখানে এল। কথাটা যেন অকস্মাৎই রাজার মনের মধ্যে উদয় হয়।

নিশ্চয়ই তাই। নচেৎ রোশনলাল যেখানে সেখানে তো নিজে যায় না? যা করবার—যেখানে যাবার তার অনুচরেরাই তো রয়েছে

রোশনলালের বিশেষ করে তার পিয়ারের লোক হচ্ছে মহেন্দ্র সিং। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তার তবে কি মহেন্দ্র সিংয়ের কাছেই রোশনলাল কোন খোঁজ পেয়েছে। কিম্বা মহেন্দ্র সিংও কাল সেই জন্যই তার এখানে এসেছিল। রাজার মনের মধ্যে চিন্তার যেন একটা ঝড় বয়ে যায়।

মধুছন্দা শুধায়, কে এল ?

রাজা বলে, রোশনলাল।

রোশনলাল ! কে লোকটা ? আপনার পরিচিত ?

হুঁ—মানে—

রাজার কথা শেষ হয় না আবার বাইরে থেকে রোশনলালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রাজা সাহেব, আছো নাকি।

মুহূর্তে অতঃপর রাজা স্থির করে ফেলে সে কি করবে। মধুছন্দার দিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে, আপনি আপনার ঘরে যান মিস্ চৌধুরী—

মধুছন্দা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না, ঘর থেকে বের হয়ে মধ্যবর্তী দরজাপথে পাশের ঘরে চলে গেল।

শ্লথ পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল রা জা।

রোশনলালই।

এক গাল হেসে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রোশনলাল বলে, কি ব্যাপার হে রাজা সাহেব, দিন দুপুরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলে নাকি।

না। কিন্তু কি ব্যাপার রোশনলাল তুমি হঠাৎ আমার মত গরীবের ঘরে ?

ছিঃ ছিঃ ওকথা বলছ কেন রাজা সাহেব, তোমার সঙ্গে আমার কতকালের দোস্তি !

তা ঠিক ! কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

কি আর একটা সুখবর পেলাম তাই—

সুখবর ?

হ্যাঁ—সুখবর নয়—মেয়ে জাতটার প্রতিই যে হাড়ে হাড়ে চটা শেষ পর্যন্ত সে সাদি করেছে শুনলাম যখন—

তাই কি ?

দেখতে এলাম তোমার স্ত্রীকে।

আমার স্ত্রী !

হ্যাঁ, কোথায় সে ? ডাকো। তার জন্য দেখো কি এনেছি, বলতে বলতে পকেট থেকে একটা ভেলভেটের কেস বের করে রোশনলাল।

স্প্রিংটা টিপতেই ডালাটা খুলে গেল এবং একটা দামী হীরার আংটি কেসের মধ্যে ঝলমল করে উঠল !

রাজা স্তব্ধ।

বাঃ কই হে, ডাকো তোমার স্ত্রীকে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

কিন্তু সে তো নেই—

নেই ! কেসের ডালাটা খুট্ করে বন্ধ করে, কেসটা পকেটে রাখতে রাখতে শুধায় কথাটা রোশনলাল ওর মুখের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

না—কাল রাত্রে সে চলে গেছে।

চলে গিয়েছে—

হ্যাঁ—মানে তার বাপের বাড়ি।

হুঁ। তাহলে দেখা হল না।

না।

তা আর কি হবে। পরে না হয় এক সময় এসে দেখে আলাপ করে যাওয়া যাবে। এখন তাহলে একটা জরুরী কাজের কথা হোক—

কাজের কথা।

হ্যাঁ—বলতে বলতে রোশনলাল পকেট থেকে মধুছন্দার একটা ফটো বের করে রাজার সামনে এগিয়ে ধরে বলে, দেখো রাজা সাহেব, এই মেয়েটি—

কে এ !

বিরাট এক ধনীর একমাত্র মেয়ে।

ধনীর মেয়ে।

হ্যাঁ, বলতে পারো কোটিপতি। মালটি-মিলিয়নীয়ার—চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীর নাম শুনেছ, পাটনা, কোলকাতা ও ধানবাদে তিন তিনটে অফিস—সেই চৌধুরী এণ্ড কোংর মৃত নলিনাক্ষ্য চৌধুরীর একমাত্র কন্যা; মাথায় মেয়েটার একটু ছিট্ আছে। বাড়ি থেকে পালিয়েছে, এই মেয়েটিকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে—

রাজা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হয় না।

রোশনলাল বলে চলে, এই ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য চাই রাজা। এবং সেজন্য জেনো আমি তোমার terms and conditions মেনে নিতে রাজী আছি। বলো তুমি কি চাও। মানে কত টাকা চাও—

রাজা কয়েকটা মুহূর্ত রোশনলালের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

তাহলে রোশনলালের আগমনের হেতু মধুছন্দাই।

কি চুপ করে রইলে যে?

ভাবছি! রাজা বলে।

ভাবছ কি?

কি বলব?

কেন এতে ভাবাভাবির কি আছে।

হঠাৎ রাজা বলে, এমন কিছু নেই কিন্তু আমি যে টার্মস্ দেব তুমি মেনে নিতে রাজী আছ রোশনলাল?

বল কি তোমার টার্মস্।

পঁচিশ হাজার টাকা।

কি বললে! চম্‌কে ওঠে রোশনলাল।

পঁচিশ হাজার টাকা!

মুহূর্তকাল স্থির দৃষ্টে চেয়ে রইল রোশনলাল রাজার মুখের দিকে, তার পর বলে, বেশ—রাজী।

রাজী?

হ্যাঁ।

তাহলে আজ সন্ধ্যার দিকে তোমার নতুন গাড়িটা আমি চাই—

আমার গাড়িটা!

হ্যাঁ—

কিন্তু কি করবে গাড়িটা দিয়ে?

রাত দশটায় তোমার কাছে গিয়ে তোমার জিনিস তোমাকে আমি পৌঁছে দেব।

সত্যি বলছো!

যদি বিশ্বাস না হয়তো—

না, না—তোমাকে বিশ্বাস করব না! নিশ্চয় করব—

তবে পাঠিয়ে দিও গাড়ি। আর তোমার ড্রাইভারকে instruction দিয়ে দিও—সে এখানে গাড়ি পৌঁছে দিয়েই চলে যাবে—

বেশ।

তবে সেই কথাই রইল। এখন এসো।

মাথা নীচু করে রোশনলাল ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

এবং সে বেরুবার মুখে রাজা আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, ঠিক সন্ধ্যায় গাড়ি পাঠাবে মনে থাকে যেন—

রোশনলাল কোন জবাব দেয় না। রাজা দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রাজা তখন অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। পাশের ঘর থেকে মধুছন্দার কানে ওদের পরস্পরের সব কথাই গিয়েছে।

মধুছন্দা ঘরে এসে ঢুকতেই ওর পদশব্দে রাজা মুখ তুলে তাকাল মধুছন্দার দিকে। ম্লান কণ্ঠে মধুছন্দা বলে, কি হবে রাজা সাহেব?

না, না—ও নামে আপনি অন্ততঃ আমাকে ডাকবেন না মিস্ চৌধুরী—রাজা মিনতি করুণ কণ্ঠে বলে ওঠে।

কিন্তু—

রাজা বলবেন—শুধু না হয় রাজাই বলবেন! কিন্তু কি হল—

অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে? যদিও ভয় পাবার মতই লোকটা কিন্তু আমি যখন একবার আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি—রোশনলাল বলুন শুভঙ্কর বলুন—দুষ্মন্তই বলুন কারও ক্ষমতা নেই আপনার গায়ে একটি আঁচড় বসায়। তার পরই একটু থেমে পুনরায় বলে, মিস্ চৌধুরী, সত্যি পা পিছলে একদিন এ পথে এসে পড়েছি এবং ঐ ওদের মতই শয়তান আমিও, কিন্তু জানবেন শয়তানদেরও একটা ধর্ম আছে। এইটুকু বিশ্বাস অন্তত আপনি আমার উপরে রাখবেন।

সে বিশ্বাসটুকু না থাকলে, মধুছন্দা জবাব দেয়, আপনিই কি মনে করেন এক মুহূর্তও আর আপনার এখানে আমি থাকতাম।

আপনি সত্যি সত্যিই আমাকে বিশ্বাস করেন মিস্ চৌধুরী?

করি!

আশ্চর্য!

কি আশ্চর্য!

আজ কয়দিন থেকে কি মনে হচ্ছে জানেন?

কি?

সময় বুঝি এখনও ফুরিয়ে যায় নি? কথাটা বলতে বলতে বুঝি মুহূর্তের জন্য গলাটা ধরে এসেছিল রাজার কিন্তু পরক্ষণেই সে হেসে ফেলে বলে, nonsense! রাজা is an idiot।

রাজা?—কি যেন বলতে যায় মধুছন্দা।

হ্যাঁ—শুনুন—বাধা দিয়ে রাজা বলে।

কি?

আর এখানে এক মুহূর্তও নয়। এর পর এখানে আপনি থাকলে আপনাকে আর হয়তো ওদের গ্রাস থেকে বাঁচাতে পারব না।

কিন্তু কোথায় যাব?

কোথায় যাওয়া যায় তাই না? রাজা যেন একটু চিন্তিত।

মধুছন্দা বলে, আমিই চলে যাব?

চলে যাবেন।

হ্যাঁ।

কোথায় ?

দেখি—অন্য কোথায়ও না স্থান হয়—রাস্তা তো আছে।

পাগল। শুনুন—এক জায়গায় আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

কোথায় ?

বর্ধমান।

বর্ধমানে !

হ্যাঁ—সেখানে আমার এক ছোটবেলার ডাক্তার বন্ধু আছে। তার হাতে গিয়ে আপনাকে তুলে দেব—

কিন্তু—

হ্যাঁ, মিস্ চৌধুরী, আমার বিশ্বাস যে আপনাকে হয়তো এই বিপদ থেকে একমাত্র আমার সেই বন্ধুই উদ্ধার করতে পারবে—

কিন্তু—

আর কিন্তু নয়—সন্ধ্যাবেলা রোশনলাল গাড়ি পাঠিয়ে দেবে, সেই গাড়িতে চেপে সোজা দুজনে চলে যাব বর্ধমান।

তার পর আপনি ?

আমি ! আমার জন্য আমি ভাবি না। সে যাহোক একটা ব্যবস্থা হবেই। রাজা মৃদু হাসে।

না। মধুছন্দা শান্ত কণ্ঠে বলে।

কি না ?

আমি যাব না সেখানে।

না, না—মিস্ চৌধুরী, আপনি বুঝতে পারছেন না, ওরা যে ভাবে চারিদিক থেকে আট ঘাট বেঁধেছে, এ ছাড়া আর আমি কোনো উপায় দেখছি না।

আমার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না ! আমার জন্য কেন আপনাকে আমি বিপদের মধ্যে ঠেলে দেব ?

বিপদ। না মিস্ চৌধুরী, বিপদ আমার হবে না। তা ছাড়া তেমন বিপদ যদি আসেই রাজা সে বিপদকে ঠেকাতে পারবে।

না—

ছেলেমানুষী করবেন না। সন্ধ্যার পরই আমরা বেরুব। দৃঢ় কণ্ঠে শেষ কথাগুলো বলে রাজা।

॥ ১৮ ॥

বর্ধমানে যে ছোটবেলার ডাক্তার বন্ধুর কথা রাজা মধুছন্দাকে বলেছিল সে হচ্ছে ডাঃ রণবীর চ্যাটার্জী।

দীর্ঘকাল পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হলেও রণবীরকে রাজা ভাল করেই চিনত। মধুছন্দার সমস্ত কথা শুনলে যে রণবীর তাকে সাহায্য করবে তার এই বিপদে সর্ব প্রকারে সে সম্পর্কে রাজা স্থির নিশ্চিত ছিল।

এখন তার ওখানে গিয়ে পৌঁছনো।

সেই ব্যাপারেই রাজার সংশয় ছিল। শুভঙ্কর ও রোশনলাল ইত্যাদি সহজে তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। এতগুলো টাকার লোভ তারা সহজে ছাড়তে পারবে না। কিন্তু রাজা বর্ধমানে মধুছন্দাকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারে না। অন্য কোন পথই সামনে দেখতে পায় না।

সব চাইতে বড় কথা রাজা বুঝতে পারছিল, আর একটি মুহূর্ত বিলম্ব করা চলে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মধুছন্দাকে এখান থেকে ওদের নাগালের বাইরে থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। মধুছন্দাকে সে ঐ শয়তানদের কবল থেকে রাজা যেমন করে হোক বাঁচাবেই। বাঁচাতে তাকে হবেই।

সত্যিই বিচিত্র মানুষের মন। যে কোন উপায়ে এতকাল যে টাকা উপার্জন করে এসেছে—আজ সেই কিনা এত সহজলভ্য এক রাশ টাকা অনায়াসেই উপেক্ষা করছে।

কিন্তু কেন! মধুছন্দার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক! কে সে তার।

কেউ তো নয়। তবু—তবু যেন রাজার মনে হয় মধুছন্দাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করবার মধ্যে কোথায় যেন একটা তৃপ্তি আছে।

আজ রাত্রে বর্ধমানে একবার গিয়ে পৌঁছতে পারলে এবং রণবীরের হাতে তাকে একবার তুলে দেওয়ার পর ঐ মধুছন্দার সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই থাকবে না। আর হয়তো এ জীবনে পরস্পরের দেখাও হবে না। তা হোক, তবু—তবু সে মধুছন্দাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করবে।

তার পর হয়তো ঐ রোশনলালদের সঙ্গে মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে। তাও সে দাঁড়াবে।

রাজা একটা সিগরেট ধরায়। এবং সিগরেটটা টানতে টানতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে।

আর মধুছন্দা তখন পাশের ঘরে ইলেকট্রিক স্টোভে ডিম ভাজার চেষ্টা করছে। ডিম ভাজার গন্ধে এক সময় পায়ে পায়ে গিয়ে রাজা পাশের ঘরে ঢোকে।

ও কি হচ্ছে?

ওমলেট তৈরী করছি—ঘুরে রাজার দিকে তাকিয়ে মধুছন্দা বলে।

কিন্তু ব্যাপারটা খুব খারাপ হচ্ছে মিস্ চৌধুরী। রাজা বলে।

বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে মধুছন্দা, খারাপ!

নয়। কাল তো আমার নিজের রান্না নিজেকেই করে খেতে হবে। না—না—তার চাইতে সরুন, আমি ভাজি—

না—

না কেন!

আজ নয়। কথাটা বলে মৃদু হাসে মধুছন্দা।

রোশনলাল কিন্তু রাজার ওখান থেকে বের হয়ে এসে সারাদিন ব্যাপারটা চিন্তা করে। রাজা যা তাকে বললে সেটা সে বিশ্বাস করতে পারে কি না।

একবার মনে হয় রোশনলালের অবিশ্বাসের কিছু নেই, কারণ

রাজা তা না হলে, নিশ্চয়ই টাকার কথা ঐভাবে বলত না। তাছাড়া অতগুলো টাকা। রাজার মত লোক অতগুলো টাকা পাওয়ার লোভ সামলাবে কথাটা যেন রোশনলালের মন মানতে চায় না।

অবিশ্যি একটা ব্যাপারে রোশনলাল স্থির নিশ্চয়ই হয়েছিল, মধুছন্দার খবর রাজা জানে। আর তাইতেই রাজার দাবীর অঙ্কটা অস্বাভাবিক জেনেও সম্মত হয়ে এসেছে রোশনলাল।

ভেবে ভেবে অবশেষে রোশনলাল স্থির করে ব্যাপারটা তেমন হালকা করে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। গাড়ি সে পাঠাবে অবশ্যই। তবে মহেন্দ্র সিংকেও অন্য একটা গাড়িতে দূর থেকে রাজার উপরে নজর রাখতে বলবে।

রোশনলাল সেই মত বিকেলের দিকে মহেন্দ্র সিংকে ডেকে পাঠায় ও তার প্ল্যান ওকে বুঝিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা নাগাদ রোশনলালের গাড়ি তার ড্রাইভার এসে পৌঁছে দিয়ে চাবিটা রাজার হাতে দিয়ে চলে গেল। এবং ড্রাইভার চলে যাবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই রাজা ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু বেরুতে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় রাজা বলে, একটু দাঁড়ান মধুছন্দা দেবী—

খাটের নীচে একটা সুটকেস ছিল। সেটা টেনে বের করে কাপড়ের তলায় হাত চালিয়ে রাজা বের করল ছোট একটা আমেরিকান পিস্তল।

কি ওটা! বিস্মিত মধুছন্দা শুধায়!

একেবারে প্রস্তুত হয়ে বেরুনোই ভাল। এটা একটা পিস্তল।

পিস্তল!

হ্যাঁ সঙ্গে থাক এটা। রোশনলাল এণ্ড হিজ পার্টিকে বিশ্বাস নেই—তার উপর আছে শুভঙ্কর মিত্তির আর তোমার পরম হিতৈষী দুষ্মন্ত মল্লিক। চলো—

ঘরের দরজায় তালা দিয়ে দুজনে নেবে এসে রেশেনলালের নতুন ঝক্‌ঝকে ফোর্ড ফ্যালকনে উঠে বসল।

মধুছন্দা রাজার পাশেই বসে।

সাবধানের মার নেই, রাজা কিছুক্ষণ কলকাতা শহরের এদিক ওদিক চক্কোর দিয়ে বেড়াল। তার পর সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ যখন চারিদিকে জমাট বেঁধে উঠেছে, চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে, সে গাড়ি ছোটাল বি, টি, রোড ধরে।

একটা পেট্রোল পাম্প থেকে ট্যাংক ভর্তি করে পেট্রোল নিয়ে বালী ব্রিজের দিকে গাড়ি ছোটাল

বলাই বাহুল্য মহেন্দ্র সিং প্রথম থেকেই রাজার গাড়ির পিছনে ছিল। রাজার গাড়িটা দক্ষিণেশ্বরের দিকে বের হয়ে যেতেই মহেন্দ্র সিং এসে ঢুকল পেট্রোল পাম্পে।

একটা ফোন করতে পারি স্যার পেট্রোল পাম্পের লোককে বলে মহেন্দ্র সিং।

করুন— পাম্পের লোকটি বলে।

ডায়েল করতেই মহেন্দ্র সিং রোশনলালকে পেল।

কে! রোশনলাল!

হ্যাঁ—

ভাল মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা—ট্যাংক ভর্তি পেট্রোল নিয়ে এইমাত্র বালির দিকে গেল।

ফলো করো—আমি যাচ্ছি। মনে থাকে যেন যেমন করেই হোক গাড়ি আটকাবে—

O. K.

মহেন্দ্র সিং ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বের হল পেট্রাল পাম্প থেকে।

রিষড়ার কাছাকাছি এসে রাজা গাড়ির ভিউ মিরারের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

একটা কালো রংয়ের গাড়ি ঠিক তার গাড়ির হাত কুড়ি পঁচিশ পিছনে পিছনে যেন আসছে মনে হল। এবং সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা একসিলারেটারে পায়ের চাপ দেয়।

গাড়ি আরও স্পীড নেয়।

গাড়ি হঠাৎ গতি বাড়াতে মধুছন্দা জিজ্ঞাসা করে, ও কি, আরো স্পীড বাড়ালেন কেন?

সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে রাজা বলে, ভিউ মিরারের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পিছনে পিছনে একটা গাড়ি বোধ হয় আমাদের গাড়িটা ফলো করছে—

মধুছন্দা ভিউ মিরারে একবার দেখে পিছনে তাকায়। এবং একটু লক্ষ্য করেই বুঝতে পারে রাজার কথাটা মিথ্যে নয়।

সত্যিই একটা গাড়ি তাদের গাড়ির পিছনে পিছনে আসছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে।

তবু জিজ্ঞাসা করে, আমাদের গাড়িকেই ফলো করছে কি?

হ্যাঁ—

তাহলে কি হবে?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের বর্ধমান পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে। তবে এটা ঠিকই রাস্তা ফাঁকা না পেলে ওরা আমাদের বাধা দেবার চেষ্টাও করবে না।

কিন্তু জি, টি রোডে লরীর যাতায়াত সেদিন এত বেশী ছিল যে চেষ্টা করেও রাজা বেশী জোরে গাড়ি চালাতে পারে না।

এবং যার ফলে একটা নির্জন রাস্তার মধ্যেই পিছনের গাড়িটা প্রায় ওদের ধরে ফেলবার জোগাড় করে।

রাজা যত স্পীড্ দেয়, পিছনের গাড়িটাও তত স্পীড্ দেয়।

রাতটাও ছিল সেদিন অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দুখানা গাড়ি আগে পিছে চলেছে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মাইল স্পীডে।

রাজার অনুমানটা যে মিথ্যা নয় সেটা প্রমাণ হয়ে যায় অল্পক্ষণের মধ্যেই।

পিছনের গাড়িতে ছিল রোশনলাল আর মহেন্দ্র সিং। রোশনলাল পাশে বসেছিল, মহেন্দ্র সিং ড্রাইভ করছিল।

রোশনলাল মহেন্দ্র সিংকে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, আরও স্পীড দাও মহেন্দ্র সিং। যেমন করেই হোক ওদের ধরতেই হবে।

মহেন্দ্র সিং গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দেয়।

রোশনলাল বলে, আরও—

কিন্তু মহেন্দ্র সিং বলে, আর স্পীড দেওয়া সম্ভব নয় রোশনলাল। বরং তুমি এক কাজ করো—রাস্তাটা একদম ফাঁকা, গুলি চালিয়ে যদি ওদের পিছনের চাকাটা খতম করে দিতে পারো তো দেখো।

রোশনলাল হাত বাড়িয়ে আগের গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে পিস্তল ছোঁড়ে।

কিন্তু গতিবেগের মুখে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। শোঁ করে একটা গুলি হাওয়ার বেগে অন্ধকারে রাজার গাড়ির পাশ ঘেঁষে একেবারে বের হয়ে গেল।

রাজা গাড়ির গতিবেগ আর একটু বাড়িয়ে দেয়।

আবার আর একটা।

দ্বিতীয় গুলিটা রাজার গাড়ির পিছনে বডিতে লাগল একেবারে ডানদিকের মাডগার্ড ভেদ করে।

চকিতে রাজা পরিস্থিতিটা চিন্তা করে নিল।

আক্রমণকারীরা বেপরোয়া হয়ে গুলি চালাচ্ছে।

কোনক্রমে যদি একটা গুলি এসে তার ছুটন্ত গাড়ির চাকা এই গতিবেগের উপরে জখম করে তো আর দেখতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি উল্টে দুজনেরই মৃত্যু অবধারিত।

কথাটা চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গেই স্টিয়ারিংটা ধরে ডান হাতে পিস্তলটা গাড়ির জানালা পথে বের করে, পিছনের অন্ধকারে গুলি চালাল রাজা।

একটা গুলি চালাবার পর দ্বিতীয়বার টিগার টিপতে যাবে, পিছন

থেকে একটা গুলি এসে রাজার অকস্মাৎ ডান হাতের কনুইয়ের উপর বিদ্ধ হল।

ঘটনার আকস্মিকতায় ও আঘাতে মুহূর্তের জন্য বুঝি বেসামাল হয়েছিল রাজা। গাড়িটা রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে আর একটু হলেই একটা বড় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা দিচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই চোখের পলকে ডানদিকে আবার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটা বাঁচিয়ে দেয় রাজা।

ঐ সময় দেখা গেল চোখ ঝলসানো সিলস্ক্রীন্ হেড্‌লাইটের সুতীব্র আলো ফেলে পর পর অনেকগুলো গাড়ি সামনের দিক থেকে আসছে।

সামনের গাড়িগুলোও বেশ ভাল স্পীডেই আসছিল। এবং হাত কুড়ি পঁচিশের মধ্যেই ছিল একটা বাঁক। সেই বাঁক থাকার দরুনই সামনের গাড়ির আলো এতক্ষণ দেখতে পায় নি রাজা, তাছাড়া তার মন ছিল পশ্চাতের গাড়ির আক্রমণকারীদের প্রতি।

রাজা কোনমতে শোঁ করে পাশ কাটিয়ে সামনের গাড়িগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে গেল বটে কিন্তু রোশনলালের গাড়িটা দুর্ঘটনাকে এড়াতে পারল না।

রোশনলালের গাড়ি সামনের দিকের প্রথম লরীটার ডান মাডগার্ড ও বডির সঙ্গে প্রচণ্ড একটা শব্দ তুলে ধাক্কা খেয়ে রাস্তার বাঁয়ে গিয়ে উল্টে পড়ল।

মধুছন্দা অস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, কি হল?

রাজা কিন্তু কোন কথা বলে না। কথা বলবার মত তখন ক্ষমতাও নেই, গুলিবিদ্ধ ডান হাতের যন্ত্রণায় তখন সমস্ত শরীরটা যেন তার মোচড় দিচ্ছে।

কিসের একটা শব্দ হল যেন? মধুছন্দা আবার বলে।

রাজা যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে এবার কোনমতে বলে, আপাততঃ বোধ করি বেঁচে গেলাম। বর্ধমান হয়তো আপনাকে নিয়ে পৌঁছতে পারব।

দূরে একটু পরেই বর্ধমান ইয়ার্ডর আলোর মালা অন্ধকারে ভেসে ওঠে। গাড়ির গতি তখন অনেকটা কমে এসেছে। এবং সেই সময়ই নজরে পড়ে মধুছন্দার রাজার সামনের জামা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

চমকে ওঠে মধুছন্দা, একি রক্ত!

রাজা জবাব দেয় না।

থামান, থামান—রক্ত। উৎকণ্ঠিত মধুছন্দা রাজার বাঁ হাতটা চেপে ধরে।

আঃ হাত ছাড়ুন, চালাতে দিন গাড়ি আমাকে—

না, না—গাড়ি থামান আপনি—

আঃ ছাড়ুন, ছাড়ুন—কিছু আপনি করতে পারবেন না। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।

রাজা যেন সমস্ত যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে গাড়ি চালাতে থাকে।

॥ ১৯ ॥

ডাঃ রণবীর চ্যাটার্জীর সঙ্গে একদা গ্রামের স্কুলে রাজা পড়েছিল। শৈশবের বন্ধু বলতে গেলে রাজার রণবীর চ্যাটার্জী।

বিলেত থেকে পাস করে এসে রণবীর কিছুদিন সরকারী চাকরী করেছিল, তাব পর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বর্ধমান এসে প্র্যাকটিস্ শুরু করে। নিজের একটা নার্সিং হোমও আছে।

একটিমাত্র সন্তান—সে কলকাতাতেই হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়াশুনা করছে। বর্ধমানের বাড়িতে কেবল স্বামী স্ত্রী থাকে।

ডাঃ রণবীর চ্যাটার্জীর বাড়ি স্টেশন থেকে খুব বেশী দূর নয়। মস্ত বড় কম্পাউণ্ড-ওয়ালা ছোট একতলা বাড়ি। সামনের দিকে নার্সিং হোম ও পিছনের দিকে তার বাসা।

রাজা যখন কম্পাউণ্ডের মধ্যে গাড়ি নিয়ে এসে ঢুকল, রণবীরের নার্সিং হোমের অপারেশন থিয়েটারে তখন আলো জ্বলছে।

ঘণ্টা দুই ধরে একটা কঠিন লেবার কেস নিয়ে হিমশিম খেয়ে সবে ক্লান্ত ডাঃ রণবীর থিয়েটারের বাইরে বারান্দায় এসে একটা সিগরেট ধরিয়েছে।

গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে বারান্দায় এবং তার উপরে পড়ল।

রাজা এসে একেবারে সিঁড়ির কাছে গাড়ির ব্রেক কষল।

রণবীর এগিয়ে আসে, কে?

নামুন, রাজা ক্লান্ত কণ্ঠে বলে মধুছন্দাকে।

কে? রণবীর আবার প্রশ্ন করে।

ডাঃ রণবীর চ্যাটার্জী আছেন! রাজা শুধায়।

আমিই ডাঃ চ্যাটার্জী, কে আপনি।

আমি রাজা ব্যানার্জী।

কে রাজা? রণবীর চ্যাটার্জী আরও এগিয়ে এল।

ঝাপসা অন্ধকারে রণবীরের নজর পড়ে রাজার পাশেই দণ্ডায়মান মধুছন্দার উপরে।

সাদর আহ্বান জানায় রণবীর, আরে রাজা যে, হঠাৎ এ সময় কোথা থেকে? এসো, এসো—সঙ্গে ইনি কে! স্ত্রী নাকি?

না, না,—ঘরে চলো, সব কথা বলছি।

এসো।

ঘরে পা দিয়েই ঘরের আলোয় রণবীর রাজার দিকে তাকিয়েই কিন্তু চমকে ওঠে।

রক্তে রাজার সমস্ত জামা তখন লাল হয়ে গিয়েছে।

একি রাজা! এত রক্ত—

বলছি সব ভাই। আগে আমার সঙ্গের এই মহিলাটির বিশ্রামের একটা ব্যবস্থা করো ভাই। সামান্য একটু কেটে গেছে বোধ হয় হাতটা। Nothing serious!

কিন্তু এত রক্ত—তবু বুঝি প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে রণবীর।

রাজা বাধা দিয়ে বলে, আগে এর বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। তোমার স্ত্রী আছেন তো বাসায়?

হ্যাঁ।

তাঁর কাছে একে আগে পেঁৗছে দিয়ে এসো—

রণবীর তবু বুঝি ইতস্তত করে।

রাজা আবার তাগিদ দেয়, যাও—ওকে পেঁৗছে দিয়ে এসো আগে তোমার বাসায়।

কেমন যেন বিহ্বল হতভম্ভ হয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিল বোবার মত মধুছন্দা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রণবীর বললে, আসুন—

অসহায় করুণ দৃষ্টিতে তাকাল একবার মধুছন্দা রাজার দিকে।

চোখের কোল দুটি বুঝি তার ছল ছল করে ওঠে। মধুছন্দা বলে, না, আমি যাব না—

যাবেন না কি?

না, আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে আমি যাব না।

করুণ হাসি হাসে রাজা, এই দেখ পাগল, আপনি এখানে থেকে কি করবেন? রণবীর আপনাকে পেঁৗছে দিয়ে এসেই আমাকে ড্রেস করে দেবে। তা ছাড়া আপনি বিশ্বাস করুন, তেমন বেশী কিছু আমার লাগে নি। সামান্য চোট লেগেছে—যান, please!

কিন্তু—

যান। যাও রণবীর; ওঁর বিশ্রামের দরকার, ওঁকে বাড়িতে রেখে এসো।

আসুন—

রণবীর মধুছন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে আহ্বান জানাল।

ওরা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এতক্ষণ কোনমতে রাজা দাঁড়িয়েছিল কিন্তু আর পারে না। ওরা ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই সামনের চেয়ারটার উপর বসে নিজেকে

এলিয়ে দিল। অসহ্য যন্ত্রণায় যেন তখন আহত হাতটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল রাজার।

তা যাক। তার কাজটুকু সে করতে পেরেছে, পৌঁছেও দিয়েছে তাকে রণবীরের কাছে এবং মনে হয় ওর মধুছন্দা সম্পর্কে তো আপাততঃ সে নিশ্চিন্ত।

রণবীর ফিরে এসে দেখে রাজা চেয়ারটার উপরে ঝিম হয়ে বসে আছে।

রাজার কাঁধে একটা হাত রেখে রণবীর ডাকে, রাজা!

য়্যাঁ—মুখ তুলে তাকাল রাজা তার পর জিজ্ঞাসা করে, তোমার স্ত্রী জেগে ছিলেন ডাক্তার!

হ্যাঁ—

কিছু জিজ্ঞাসা করলেন?

আগে চলো অপারেশন থিয়েটারে তোমার উণ্ডটার ব্যবস্থা করি তারপর সব শুনব।

রণবীর তাগিদ দেয় রাজাকে।

রাজা উঠে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে বলে, চলো।

রাজাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যায় রণবীর অপারেশন থিয়েটারের দিকে।

অপারেশন টেবিলে শুইয়ে রণবীর উণ্ডটা পরীক্ষা করে চমকে ওঠে, একি! এভাবে আহত হলে কি করে?

পিস্তলের গুলিতে!

সে কি!

হ্যাঁ—That's a long story!

থাক্—থাক্—শোনা যাবে এখন সব পরে—বলে রণবীর তখুনি নার্সকে ডেকে রাজার চিকিৎসায় তৎপর হয়।

মাংস তো থেঁতলে গেছেই, হাড়েও চোট লেগেছিল।

প্রায় আধঘণ্টা লেগে যায় রণবীরের হাড় সেট করে উণ্ড স্টাচ ও ড্রেস করতে। এবং অপারেশন শেষ হবার পর রাজাকে একটা

কেবিনে এনে শোয়ার কথা বলতে, সে বলে প্রয়োজন হবে না, রণবীর —আমি এই চেয়ারটায় বসছি, তুমিও বোস—তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

না, না—তোমার বিশ্রামের দরকার এখন—

বিশ্রাম পরে নেব, আগে তুমি আমার কথা শোনো—

একপ্রকার জোর করেই বসাল রাজা রণবীরকে এবং নিজেও একটা চেয়ারে বসল।

সংক্ষেপে মধুছন্দার কাহিনী বলে গেল রাজা।

রাজার মুখে মধুছন্দার কাহিনী শুনে রণবীর কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

রাজা মৃদু কণ্ঠে ডাকে, রণবীর?

রণবীর রাজার মুখের দিকে তাকাল, তুমি ভাল কর নি রাজা!

ভাল করি নি?

না।

কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো রণবীর, প্রথমটায় মেয়েটার প্রতি আমার মনোভাব যাই থাক না কেন শেষ পর্যন্ত যে ওকে ঐ ওদের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য কেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম তা আমি নিজেও জানি না। যাক সে কথা—ওকে ওদের হাত থেকে বাঁচাব সঙ্কল্প নেবার পর কিছুতেই যখন কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না সামনে হঠাৎ মনে হল তোমার কথা।

বুঝলাম। কিন্তু তুমি বোধহয় পুলিসে খবর দিলেই ভাল করতে রাজা।

তা কি আমিও জানিনা ভাই—কিন্তু আমার পক্ষে তার কোন উপায় ছিল না—

উপায় ছিল না।

না।

কিন্তু কেন?

কেন! সে অনেক কথা ভাই। শুধু জেনো সম্ভব ছিল না আমার

পক্ষে বলেই পারি নি। কিন্তু যাক্ সে কথা—আমি তোমার কাছে অনেক আশা করেই এসেছি রণবীর—

রণবীর চুপ করে থাকে।

রাজা বলে, যেমন করে হোক ওকে তোমায় বাঁচাতেই হবে এ বিপদ থেকে—তোমার হাতেই তাই ওকে তুলে দিয়েছি—

কিন্তু রাজা, আমি—

তুমি ডাক্তার মানুষ, তুমি অনায়াসেই প্রমাণ করতে পারবে ওর মাথায় কোন দোষ নেই—

কিন্তু আমার মনে হয় রাজা এখনও বোধহয় তুমি থানায় গিয়ে ওর সব কথা খুলে বললে ভাল হত—আমার থানা অফিসারের সঙ্গে জানা শোনা আছে এখানকার। আমি বরং—

মৃদু হাসল রাজা। তার পর বাধা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে, বললাম তো একটু আগে তুলে দিই নি কেন সে অনেক কথা ভাই, আজ বলবার সময় নেই, যদি কখনো সময় বা সুযোগ পাই বলব সব কথা। তবে এইটুকু আজ জেনে রাখো রণবীর, স্কুল-জীবনের তোমার সেই পরিচিত বন্ধু রাজা ব্যানার্জী আর আজকের রাজা ব্যানার্জীর মধ্যে অনেক তফাত।

রাজা!

হ্যাঁ ভাই, সহজ সরল জীবনের পথে তোমরা এগিয়ে গিয়েছ, কিন্তু আমি—থাক সে কথা, তুমি শুধু কথা দাও—মধুছন্দার ব্যবস্থা তুমি করবে?

করব। আমার যথাসাধ্য করব।

ব্যাস্, আর আমি কিছু চাই না, এবারে আমার ছুটি। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় রাজা।

ওকি উঠছ কেন! ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে রণবীর।

উঠছি, কারণ এখুনি আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে।

ফিরে যেতে হবে, কোথায়?

কলকাতায়।

এই অবস্থায়! তুমি কি পাগল হলে রাজা।

মৃদু হাসে রাজা, ভয় নেই। অনেক দুঃখ, অনেক অনিয়ম এবং অনেক অত্যাচারে এ দেহ লোহার চাইতেও শক্ত হয়ে গিয়েছে। ও সামান্য আঘাতে কিছু হবে না।

না, না—as a doctor, শুধু ডাক্তার কেন, বন্ধু হিসাবে তোমাকে এ অবস্থায় আমি যেতে দিতে পারি না রাজা। তা ছাড়া এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা—

যেতে আমাকে হবেই—আর এখুনি—

রাজা!

বাধা দিও না রণবীর। I must go।

কিন্তু মধুছন্দা, তার সঙ্গে যাবার আগে একবার দেখা করবে না! বুঝতে পারে রণবীর রাজার শেষের কথায়, তাকে বাধা দিয়ে আর কোন ফল হবে না তাই বুঝি শেষ চেষ্টা করে মধুছন্দার কথাটা তুলে।

মধুছন্দা! না—তার সঙ্গে আর দেখা করার তো প্রয়োজন নেই—

কিন্তু সে যখন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করবে?

কিছু বলতে হবে না! সে বুঝতে পারবে। আচ্ছা চলি।

রাজা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

যেখানে এক্সিডেন্টটা গতরাত্রে হয়েছিল, গাড়িটা তখনো উল্টে পড়েছিল। কেবল ইতিমধ্যে অর্ধমৃত অবস্থায় মহেন্দ্র সিং ও রোশনলালকে নিকটবর্তী হাসপাতাল পুলিস রিমুভ করেছিল।

একটা শূন্য মন নিয়ে রাজা কলকাতায় ফিরে এল ঐদিন সন্ধ্যা রাত্রি নাগাদ। এবং ফিল্মে সোজা রোশনলালের গ্যারেজে গিয়ে তাঁর গাড়িটা পৌঁছে দিয়ে এল।

রোশনলালের গাড়িটা পৌঁছে দিয়ে একটা ট্যাক্সীতে চেপে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় ট্যাক্সী ড্রাইভারকে বলল, পার্ক সার্কাস চলো।

কিংশুকের ঠিকানাটা ভোলে নি রাজা। এবং সেই ঠিকানানুযায়ী কিংশুক রায়ের বাড়িটা খুঁজে বের করতেও তার বেশী কষ্ট হয় না।

॥ ২০ ॥

কিংশুক বাড়িতেই ছিল। নীচের বৈঠকখানায় বসে ছিল কিংশুক ঐ সময়।

ভৃত্য এসে বললে, একজন বাবু তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিরক্ত হয়ে কিংশুক বলে, বলে দে যা দেখা হবে না।

দরজার গোড়া থেকে ঐ সময় রাজা বলে ওঠে, একটা জরুরী ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি মিঃ রায়—

কে?

রাজা ভৃত্যর পিছু পিছু এসেই দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল, হাতে প্লাস্টার করা—স্লিং দিয়ে গলার সঙ্গে ঝোলানো হাতটা।

রাজার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় কিংশুক।

ভিতরে আসতে পারি?

আসুন—

রাজা ঘরে এসে ঢুকল, আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না কিংশুকবাবু—আর চিনবার আমাকে আপনার কোন প্রয়োজনও নেই, কেবল একটা সংবাদ দিতে আপনাকে আমি এসেছিলাম—

কি সংবাদ।

আপনি মধুছন্দা দেবীর—

কি—কি বললেন?

ব্যস্ত হবেন না—মধুছন্দা দেবীর জন্য কাগজে পুরস্কার ঘোষণা করে আপনি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

হ্যাঁ, হ্যাঁ—দিয়েছিলাম। আপনি পেয়েছেন, পেয়েছেন তার কোন সংবাদ!

পেয়েছি—

পেয়েছেন, কোথায়, কোথায় সে !

তার আগে আপনাকে আমার একটা প্রশ্ন আছে মিঃ রায়।

প্রশ্ন।

হ্যাঁ, আপনি কে তার ? কি সম্পর্ক আপনার তার সঙ্গে ?

আমার—আমার কি সম্পর্ক ?

হ্যাঁ। সেটা আগে আমি জানতে চাই।

কিন্তু আগে বলুন মধুছন্দা কোথায়, সে কেমন আছে ?

ব্যস্ত হবেন না, বললাম তো সে ভালই আছে। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

কি প্রশ্ন ?

তার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ?

আমার ?

হ্যাঁ—বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন কারণ আমার সময় খুব কম।

সম্পর্ক এখনও গড়ে ওঠে নি তবে—

তবে ?—বলুন—থামলেন কেন ? .

সে—মানে সে আমার বাগদত্তা—

মৃদু হাসল রাজা কথাটা শুনে, তার পর বোধ করি একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে বলে, হুঁ ঐ রকমই একটা কিছু আমি অনুমান করেছিলাম। যাক্ আর একটা কথা—

বলুন !

আপনি সত্যিই তাকে ভালবাসেন ?

বাসি !

তবে এতদিন তার খোঁজখবর নেন নি কেন !

বিশ্বাস করুন দু বছর ধরে তাকে যে পাগল সাজিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, আমি তার কিছুই জানি না—জানতেও পারি নি কারণ আমি বিদেশে ছিলাম। কোন খবর তার জানতে পারি নি। ফিরে এসে রাঁচীতে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে ছন্দার হোস্টেলের

মেট্রনের কাছে প্রথম সংবাদটা শুনি। কিন্তু বিশ্বাস করি নি আমি—বিশ্বাস করি নি—

সত্যিই মিথ্যা—সে পাগল নয়। দুষ্মন্তবাবুর সব ষড়যন্ত্র, মধুছন্দা দেবীর সঙ্গে দেখা হলেই আপনি সব জানতে পারবেন।

কিন্তু সে কোথায়?

ব্যস্ত হবেন না কিংশুকবাবু, আপাততঃ নিরাপদ জায়গাতেই তিনি আছেন!

কোথায়?

বর্ধমানে! ডাঃ রণবীর চ্যাটার্জীর ওখানে—।

আমি এখুনি যাব।

হ্যাঁ যান। তিনি বোধহয় আপনাকে ভুল বুঝে আপনার উপরে অভিমান করে আছেন।

কিন্তু আপনি কে? আপনার পরিচয় তো দিলেন না।

আমার পরিচয়!

হ্যাঁ—

আমার পরিচয় দিয়ে আপনার কি হবে—আপনি এখুনি বর্ধমানে যান, আচ্ছা আসি। নমস্কার।

রাজা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ভোর রাত্রে গিয়ে গাড়ি নিয়ে পৌঁছল কিংশুক রণবীর চ্যাটার্জীর ওখানে।

রণবীর দেখে ওকে প্রশ্ন করে, আপনি!

আমার নাম কিংশুক রায়।

ও। তা কি চান?

মধুছন্দা এখানে আছে?

কে বললে?

আছে কিনা তাই বলুন, সংবাদ পেয়েই এসেছি আমি!

কিন্তু কে সেটাই যে আগে আমার জানা দরকার।

আমার নাম বললাম তো কিংশুক রায়। মধুছন্দাকে গিয়ে বলুন, আমার নাম, তাহলেই সে আমাকে চিনতে পারবে।

বেশ, আপনি অপেক্ষা করুন আমি আসছি—

রণবীর কিংশুককে বসিয়ে রেখে চলে গেল।

কিন্তু একটুক্ষণ বাদে রণবীর ফিরে এসে বললে, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান না বললেন।

আমার নাম বলেছিলেন ?

বলেছিলাম।

আর একবার দয়া করে তাকে গিয়ে বলুন, আমার সব কথা শোনবার পরও যদি আমাকে না ক্ষমা করে তো চলে যাব আমি—

কিন্তু কিংশুকের কথা শেষ হল না, মধুছন্দা ঘরে এসে ঢুকল, কেন এসেছেন আপনি ?

ছন্দা !

এগিয়ে যায় কিংশুক

ফিরে যান আপনি !

ছন্দা শোনো—

না, না—বিশ্বাসই তো করেছেন, আমি পাগল।

শোনো ছন্দা, আমার সব কথা আগে শোনো, সব কথা আগে আমাকে বলতে দাও, তার পর—

না, না, না—যান আপনি, যান—

ছন্দা, বিশ্বাস করো কিছুই আমি জানতাম না। আর জানবার পরও কোন কথা বিশ্বাস করতে পারি নি বলেই পুলিসে ডাইরী করিয়েছি, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি—। আর বিশ্বাস করলে কি সংবাদ পাওয়ামাত্রই এইভাবে ছুটে আসতাম। আমার সঙ্গে চলো মধুছন্দা—সব ব্যবস্থা আমি করব।

না, আমি যাব না, আপনি চলে যান—কথাটা বলে মধুছন্দা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ায়।

কিংশুক বাধা দিয়ে বলে। শোনো—শোনো ছন্দা—যেও না—please.

না, না—কোন কথাই আর আপনার আমি শুনতে চাই না। অনেক চিঠিই আপনাকে আমি দিয়েছি কিন্তু—

চিঠি।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—চিঠি—

কিন্তু একটা চিঠিও আমি পাই নি বিশ্বাস করো।

না পেয়ে থাকেন না পেয়েছেন—আপনি যান।

মধুছন্দা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না বুঝতে পারছি। ঠিক আছে বিশ্বাস তুমি আমাকে করো না। কিন্তু এখানেই বা এভাবে অজ্ঞাত—অপরিচিত চোরের মত লুকিয়ে পড়ে থাকবে কেন? কার ভয়ে—কিসের ভয়—তোমার নিজের বাড়িতে অন্ততঃ আমায় তোমাকে পৌঁছে দিতে দাও—মিনতি-করুণ কণ্ঠে কথাগুলো বলে এবারে কিংশুক।

না—সেখানে আর আমি যাব না।

কেন! নিজের বাড়িতে তুমি ফিরে যাবে না কেন?

তুম্মস্তদাই সব নিক—আমি কিছু চাই না।

সে নেবে কোন্ অধিকারে?

কোন্ অধিকারে আবার—তাই তো সে চেয়েছিল। সেই নিক—

তোমার সব কিছু তুমি দিতে হয় তাকে দেবে কিন্তু সে যা করেছে তার শাস্তি হওয়া তো দরকার?

শাস্তি!

হ্যাঁ—আর সেটা তুমি না ফিরে গিয়ে পুলিসের কাছে সব কথা বললে প্রমাণই বা হবে কিসে?

কিন্তু পুলিস যদি বিশ্বাস করে—

কি! কি বিশ্বাস করে?

আমি—মানে আমি—পাগল—

এবারে ডাঃ রণবীর কথা বলে, কিন্তু আপনি তো সত্যিই পাগল নন? সবটাই তো সাজানো—চক্রান্ত—কিংশুকবাবু ঠিকই বলেছেন দুষ্মন্তবাবুর শাস্তি হওয়া দরকার। আপনি ওর সঙ্গে ফিরে যান।

যাব! আপনি বলছেন ডক্টর চ্যাটার্জী?

মধুছন্দা রণবীরের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়?

হ্যাঁ যান।

কিংশুক আবার বলে, চলো মধুছন্দা, আর দেরি করো না—

॥ ২১ ॥

কলকাতায় এসে কিন্তু দুষ্মন্তর আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সে কলকাতাতেও নেই—রাঁচীতেও ফিরে যায় নি।

মিঃ সান্ন্যাল সলিসিটার ব্যাপারটা জানতে পেরে কেবল বলেছিলেন, তাকে আর পাওয়া যাবে না কিংশুক। এখানকার কাজ তার ফুরিয়েছে—যা নেবার তা সে গুছিয়েই নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

কথাটা মিঃ সান্ন্যালের যে মিথ্যা নয় পরে জানা গিয়েছিল কারণ লোহার সিন্দুকের চাবী তার কাছেই ছিল—সিন্দুকে সে কিছুই রেখে যায় নি।

অবিশ্যি মধুছন্দার সে জন্য কোন দুঃখ ছিল না।

আর পাওয়া গেল না রাজার কোন সংবাদ।

মধুছন্দা নিজে এবং কিংশুক রাজার ফ্ল্যাটে গিয়ে রাজার খোঁজ করেছিল, কিন্তু ফ্ল্যাটের দরজায় তালা বন্ধ।

দশদিন নাকি সে বাড়িতে ফেরে না। কোথায় সে বর্তমানে আছে, কি বৃত্তান্ত কেউ বলতে পারল না।

সানাই বাজছে। আজ মধুছন্দার বিয়ে।

মধুছন্দার কলকাতার বাড়িটা ফুলে ফুলে আর আলোয় আলোয় উৎসব মুখরিত।

মধুছন্দার মামা এসেছেন। তিনিই কন্যা সম্প্রদান করবেন।

রাজেন্দ্রাণীর মতই সেজে ঘরের মধ্যে বসেছিল মধুছন্দা।

আর বারবার মনের মধ্যে একজনের মুখটা ভেসে উঠছিল। আর মনের কোথায় একটা ব্যথা গুমরে উঠছিল।

ভৃত্য এসে এক গোছা রজনীগন্ধা ও একটা চিঠি মধুছন্দার সামনে ধরল।

কি রে রামু?

একজন ভদ্রলোক দিয়ে গেলেন আপনাকে দেবার জন্য।

কেমন যেন বিস্ময় অনুভব করে মধুছন্দা। একজন ভদ্রলোক চিঠিটা দিয়ে গিয়েছেন। কে আবার ভদ্রলোক চিঠি দিয়ে গেল তার নামে। প্রশ্নটা যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই উচ্চারিত হয়।

বলে, একজন শুদ্রলোক?

আজ্ঞে—

কোথায় তিনি?

তিনি তো নেই—

নেই?

না। চিঠিটা দিয়েই চলে গেলেন।

চিঠিটা দিয়েই চলে গেলেন, কিছু আর বলেন নি?

না—

ওঃ আচ্ছা—তুমি যাও—

ভৃত্য চলে গেল।

মধুছন্দা মুহূর্তকাল তার পরও যেন কি ভাবে। তার পর চিঠিটা খাম ছিঁড়ে আলোর সামনে মেলে ধরতেই যেন চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি চিঠির অপর পৃষ্ঠায় উল্টে নামটা দেখে।

থর থর করে হাত দুটো তখন কাঁপছে মধুছন্দার। রাজা, রাজা চিঠি লিখেছে?

রাজা লিখেছে।

সুচরিতাসু,

কি বলে তোমায় আজ সম্বোধন করি বলো তো। আর কি নামেই বা ডাকি, তুমি যে সব নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছ।

সব নামের মধ্যেই যে তোমার নাম। তাই কোন নাম ধরে তোমায় ডাকলাম বা না ডাকলাম তাতে কার কি এসে গেল। তুমিই তো নাম। সব নামের মধ্যেই যে তুমি আজ ছড়িয়ে আছ।

ওদিকে চিঠিটা পৌঁছে দিয়ে রাজা আর একটা মুহূর্ত দেরি করে না। সোজা রাস্তায় নেমে হন হন করে হাঁটতে শুরু করে। রাজা যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে। ক্রমে পশ্চাতের আলোকিত বাড়িটা মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে যায় উৎসবের বাড়ির সেই সানাইয়ের শব্দটা ক্রমশ একটু একটু করে।

আর কেন! কাজ তো তার শেষ হয়ে গিয়েছে। শেষ কর্তব্যটুকু সে পালন করতে পেরেছে।

এবারে দূরে অনেক দূরে তাকে চলে যেতে হবে। হ্যাঁ দূরে কারণ এই কলকাতা শহরের মোহ তার কেটে গিয়েছে।

অনেক স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এই শহর কলকাতা। এই শহরের রাস্তা ঘাট সব কিছুর সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়।

দিনে রাত্রে দ্বিপ্রহরে কত ঘুরেছে এই শহরের পথে পথে। কখন আনন্দে, কখন নিরানন্দে, কখন উৎসাহে কখন ক্লান্তিতে।

অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল এই শহরের সঙ্গে একদিন এবং ভেবেছিল এ বন্ধন বুঝি শেষ দিনও ছিন্ন হবে না কিন্তু আজ সব কিছুর সমাপ্তি।

সকালেই সব কাজ প্রায় শেষ করে রেখেছিল। বাড়িওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছে।

ঘর। তার আবার ঘর। কটা দিন ধরে কি একটা ভূতই না মাথায় চেপেছিল। হন হন করে হেঁটে চলে রাজা।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আহত হাতটা ব্যথায় টন টন করছে। মেডিকেল কলেজের পাশ দিয়ে চলতে চলতে একবার থমকে দাঁড়াল রাজা। যাবে নাকি একবার ইমারজেন্সীতে। কোন একজন ডাক্তারকে দিয়ে হাতটা দেখিয়ে নেবে।

আবার মনে হয়, না থাক, কি হবে? এমন ভাবে আহত কত সময় হয়েছে রাজা। আবার একদিন আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

রাজা হাঁটার গতিটা আরও দ্রুত করে।

মধুছন্দা তখনও চিঠিটা পড়ছিল।

বড় সুখী হয়েছি।

ভাগ্যে কিংশুকবাবুর সঙ্গে এখানে এসে দেখা করেছিলাম। নচেৎ আসল সত্যটাও আমার জানা হত না। কিংশুকবাবু যে তোমাকে এতখানি ভালবাসেন জানতেও পারতাম না। আমি বলছি সুখী হবে তুমি। সত্যি কিংশুকবাবুর মত স্বামী না হলে তোমাকে মানাত নাকি। তোমার বাবা তোমার স্বামী নির্বাচন ভুল করেন নি।

বিধাতার আশীর্বাদ তুমি পেয়েছ।

আজ একটা কথা কি মনে হচ্ছে জানো? বিধাতাপুরুষটি আমার ব্যাপারে কি রসিকতাই না করেছিলেন আমার মায়ের মুখ দিয়ে আমার 'রাজা' নামটা উচ্চারণ করিয়ে, রাজাই বটে।

রাজা বৈকি। একেবারে সম্রাট। আজ ইচ্ছা করছে সেই বিধাতা পুরুষটিকে যদি একবার সামনে পেতাম। তাঁর মুখের সামনে হো হো করে হেসে উঠতে পারতাম।

আর—আর একজনের কথাও মনে পড়ছে এই মুহূর্তে আমার। আমার গর্ভধারিণী মা। যার কাছ থেকে পেয়েছি শুধু একটা তীব্র

দুঃসহ ঘৃণা সমস্ত নারী জাতটার প্রতি। উঃ কি ঘৃণাই না করেছি সমস্ত নারী জাতটাকে জ্ঞান হওয়া অবধি। এত ঘৃণা কোন পুরুষ আজ পর্যন্ত মেয়ে জাতটাকে করেছে কিনা কোন দিন জানি না।

প্রচণ্ড ঘৃণায় তোমার আগে কোন নারীর ছায়া পর্যন্ত মাড়াই নি। সর্বদা মনে হয়েছে পুরুষের জীবনে নারীর মত এতবড় শত্রু বুঝি আর নেই। কিন্তু তোমায় ধন্যবাদ, বিধাতাকে ধন্যবাদ। কারণ বাকী জীবনটা হয়তো সমস্ত নারী জাতটার প্রতি ঐ বুক ভরা বিদ্বেষ আর ঘৃণা নিয়েই একদিন এই পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নিতাম কিন্তু তুমি আমাকে সেই বিষের দহন থেকে মুক্তি দিয়েছ। আমার বিধাতাও সে বেদনা থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন।

হ্যাঁ, সে বিষ আমার অমৃতে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন আমার বিধাতা আমার জীবনে মাত্র কটা দিনের জন্য তোমাম আবির্ভাব ঘটিয়ে।

রাতের অন্ধকারে একদিন তুমি এলে অকস্মাৎ আমার অন্ধকার জীবনে। এলে যেন একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতই শুভ্র অকলঙ্ক রূপে অমৃতের আশীর্বাদ নিয়ে। সে অমৃতের আশীর্বাদে হৃদয় আমার কানায় কানায় মুহূর্তে যেন ভরে গেল। অন্ধকার জীবনটা আমার মুহূর্তে আলোয় আলোয় যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল।

সমস্ত বিষ আমার অমৃত হয়ে গেল।

আমি ধন্য হলাম, তৃপ্ত হলাম। আজ তাই চির বিদায়ের মুহূর্তে শেষ নমস্কারটি রেখে গেলাম আমার তোমারই জন্য। আর সেই সঙ্গে ঐ খেয়ালী বিধাতাটির পায়ে জীবনে প্রথম ও শেষবারের মত মাথাটা নুইয়ে জানিয়ে যাচ্ছি শেষ প্রণাম আমার।

ইতি—রাজা।

কয়েক মুহূর্ত যেন স্তব্ধ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মধুছন্দা। হাতের চিঠিটা হাতেই ধরা থাকে। তার পরই হঠাৎ চিঠিটা হাতের

মুঠোর মধ্যে ধরেই দ্রুত পদে ঘর থেকে ঐ বধূ বেশেই বের হয়ে আসে মধুছন্দা।

বারান্দায় লোক গিস গিস করছে তাদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায় সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। কে একটি মহিলা পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় যাচ্ছিস ছন্দা ?

কোন জবাব দেয় না মধুছন্দা।

তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে, একে ধাক্কা দিয়ে, ওর পাশ কাটিয়ে অন্ধের মত যেন বাইরের দিকে এগিয়ে যায়। বিস্ময়ে দু-চারজনের কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়, কে যায়, কে ও !

মধুছন্দা না, কোথায় যায় !

কিন্তু কারও কোন প্রশ্নের জবাব দেয় না মধুছন্দা, যেন দৌড়তে আরম্ভ করেছে তখন সে। মধুছন্দা ধাক্কা দিয়ে পাগলের মতই যেন আশ পাশের সকলকে সরিয়ে দিয়ে ছুটতে থাকে বাইরের দিকে।

চারিদিকে একটা গুঞ্জন একটা গোলমাল শুরু হয়ে যায়। ভিড়টা ছিল গেটের কাছে বেশী। সবে এসে তখন ফুলে ফুলে সাজানো বরবেশী কিংশুকের বিরাট ক্রাইসলার গাড়িটা বিবাহ বাড়ির সুসজ্জিত গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে।

বরবেশী কিংশুক সানাই শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে সবে মাত্র মাটিতে পা দিয়েছে মধুছন্দা ছুটতে ছুটতে সেইখানে এসে পড়ে।

পিছনে পিছনে সব আসে।

গেট বরাবর আসতেই কে যেন তাকে হাত ধরে বাধা দেবার চেষ্টা করতেই বিরক্ত কণ্ঠে তাকে সরিয়ে দিয়ে ছুটে যাবার চেষ্টা করে মধুছন্দা।

গায়ের আঁচলটা খসে তখন মাটিতে লুটোচ্ছে। গলার গোড়ের মালা ছিঁড়ে গিয়েছে। দু চোখে উদভ্রান্তের দৃষ্টি।

সবার মুখে এক কথা, কি হল, কি হল ?

কিন্তু আর বেশাদূর যেতে পারে না মধুছন্দা, হঠাৎ পায়ে বেঁধে হোঁচট খেয়ে সামনের দিকে পড়ে যায়। শেষবারের মত একটি ক্ষীণ ডাক শোনা যায় মধুছন্দার অস্ফুট কণ্ঠ থেকে কেবল, রাজা!

মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই সবাই চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে ভূপতিত মধুছন্দাকে।

কেউ বলে, সরে দাঁড়াও।

কেউ বলে, পাখা—একটা পাখা।

কেউ বলে, জল—

মধুছন্দা তখন জ্ঞান হারিয়েছে।

ঐ সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে কিংশুক। সকলকে দু হাতে সরিয়ে দিয়ে নীচু হয়ে মধুছন্দার চেতনাহীন দেহটা পরম স্নেহে দু হাত বাড়িয়ে মাটি থেকে নিজের বুকে তুলে নেয়।

সরুন আপনারা—দয়া করে একটু পথ দিন ভিতরে যাবার—

সবাই সরে দাঁড়ায়।

কিংশুক ভিতরের দিকে এগিয়ে যায়।

মধুছন্দার হাতের চিঠিটা মাটিতে পড়েছিল, সবাই সেটা মাড়িয়ে মাড়িয়েই কিংশুকের পিছনে পিছনে এগিয়ে যায়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মধুছন্দা চোখ মেলে তাকায়।

একেবারে চোখের সামনে চন্দন চর্চিত একখানি মুখ।

কে?

আমি কিংশুক—কিংশুক অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়।

আপনা থেকেই আবার চোখ দুটি বুজে যায় যেন মধুছন্দার।

সানাই বাজতে থাকে।

—শেষ—